ডেভিড হেয়ার



জ্যোতির্ভূষণ দত্ত

পৃথিবীর সব সাহিত্যই মানুষের জন্য, মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এক একজন মহাপুরুষ উজ্জ্বল দীপশিখা হাতে অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে আছেন। এঁরা সমাজের বরেণ্য আচার্য। কঠোপনিষদে তাই তাঁদের কাছে তত্ত্ব জেনে নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই আচার্যদের আচরণই আমাদের আচরণীয়। তাঁদের জীবনকথাই আমাদের জীবনের পাথেয়, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। স্মরণীয় মানুষদের অসাধারণ জীবনসাধনার সাফল্যের পাশাপাশি তাঁদের ব্যর্থতা, দুর্বলতা, স্খলন-পতন সবই পূর্ণাঙ্গ জীবনকথার অন্তর্গত এবং আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই বিচারে "চারিত্রপূজা" গ্রন্থ সংকলনে ব্রতী হয়েছিলেন।



ডেভিড হেয়ার

জ্যোতির্ভূষণ দত্ত

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

Life of DAVID HARE
by
Jyotirbhusan Dutta

First Published
January, 2009

ISBN 978-81-7572-299-6

Price : Rs. 48/- only

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০০৯

দাম ঃ ৪৮ টাকা

গ্রন্থতীর্থ ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
থেকে এস.বি. নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড
প্রসেস, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড,
কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত

গ্রন্থটি 'ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ'-এ
আমার প্রাক্তন সহকর্মি এবং প্রিয় ছাত্রদের
উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হলো।

পশ্চিমবঙ্গ এস. সি. ই. আর.
টি-র গ্রন্থাগারের জন্য
— জ্যোতি চন্দ
০৪/০৩/০৯

নিবেদন

উনবিংশ শতকের তিন/চার দশকে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষানুসারী আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যার সূত্র ধরেই বঙ্গীয় নবজাগৃতিধারার উন্মেষ এবং আধুনিক ভারতের জন্ম। ১৮০০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইউরোপিয় কর্মিদের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ চালু হয় এবং ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর ত্রয়ী অর্থাৎ উইলিয়াম কেরি, মাশম্যান ও ওয়ার্ড-এর উদোগে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর কলেজ এবং শ্রীরামপুর প্রেস। এই প্রেস থেকেই প্রকাশিত হল ওই বছরেই প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র 'সমাচার দর্পণ'। এদেশের পড়ুয়াদের টোলে ও পাঠশালায় পঠনপাঠনের যে ব্যবস্থা চালু ছিল দ্রুত তার পরিবর্তন লক্ষিত হয় — ১৮১৫ সালের মধ্যেই বঙ্গাদেশে স্থাপিত হল দু'শোর বেশি নতুন বিদ্যালয়। ১৮১৭ সালে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপনের পর ওইসব বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতি, প্রকাশ ও বিতরণের কাজও শুরু হল। ১৮১৮ সালে 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১৮২৩ সালে 'এডুকেশন কাউন্‌সিল' এবং ১৮২৪ ও ১৮৩৫ সালে যথাক্রমে 'সংস্কৃত কলেজ' ও 'কলিকাতা মেডিকেল

কলেজ' প্রতিষ্ঠাও ভারতের শিক্ষা জগতে নতুন দিগন্তের সূচনা করল।

উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলির পেছনে ছিল বহু ইউরোপিয় ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টা ও মূল্যবান অবদান। কিন্তু এই সব ইউরোপিয় ব্যক্তিবর্গ মূলত দু'টি উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিক্ষার প্রাঙ্গনে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সক্রিয় ছিলেন। একদল মিশনারি ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অত্যাবশ্যক অনুঘটক হিসেবে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রসারের কাজটি ছিল গৌণ। অন্য আর এক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজন এদেশে ব্রিটিশ প্রশাসনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং মুখ্যত উক্ত স্বার্থ পূরণের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করতেন। কিন্তু কতিপয় বিদেশি শিক্ষানুরাগী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং তার সমস্যার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। তাঁরা সে'যুগের মানবতাবাদী দর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবাসীদের প্রতি ভালোবাসা ও ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধার মানসিকতা নিয়েই এদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। ডেভিড হেয়ার সেই সব দুর্লভ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

অনেকদিন হেয়ারের নামাঙ্কিত স্নাতকোত্তর মহাবিদ্যালয় 'ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ'-এ শিক্ষকতার কাজে যুক্ত থাকার সুবাদে স্বাভাবিক নিয়মে আমার মধ্যে প্রাথমিকভাবে এই মহান ব্যক্তিটি সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহের

উন্মেষ ঘটেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডেভিড হেয়ার প্রয়াত হয়েছেন ১৮৪২ সালে। কিন্তু ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রতিষ্ঠা ১৯০৮ সালে। সেক্ষেত্রে কলেজটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডেভিড হেয়ারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সংযোগ থাকার কথা নয়। তাঁর প্রতি বাঙালিদের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসেবে পূর্ব ভারতের প্রথম এই স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯০৮ সালে মাত্র কয়েক মাসের জন্য 'হেয়ার সাহেবের স্কুল' হেয়ার স্কুলের বাড়িতে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রশিক্ষণের কাজ প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছিল — কলেজের নামকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। বঙ্গদেশের তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা এইচ. আর. জেম্‌স-এর প্রস্তাব অনুসারেই কলেজটির এই নাম দেওয়া হয়।

১৯৭৫ সালে ডেভিড হেয়ারের দ্বিশতবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলেজে হেয়ার সম্পর্কে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা এবং নাটকটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে আমার সহকর্মিবৃন্দের এবং ছাত্রদের সহযোগিতার বিষয়টি সবিনয়ে স্মরণ করি। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ছে প্রাক্তন ছাত্র শ্রীপ্রত্যুষ পড়ুয়া, শ্রীসমীর দাস এবং শ্রীশিবশংকর চক্রবর্তীর কথা। এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার সময় ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ

রচনা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। পরে কালের নিয়মে সে কথা বিস্মৃত হয়েছি। কিন্তু কিছুকাল আগে অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ এবং 'গ্রন্থতীর্থ'-এর প্রাণপুরুষ শ্রীশংকরীভূষণ নায়ক আমার সেই ইচ্ছেটা শুধু উস্‌কে দিলেন তাই নয়, অগ্রজের অধিকার বোধে দ্রুত কাজটি সমাধা করার জন্য অপ্রতিরোধ্য চাপ সৃষ্টি করলেন এবং এই চাপের সাথে তিনি যুক্ত করতে পারলেন আমার স্ত্রী নীতার পক্ষ থেকে ওই চাপের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে— এগুলির অভাবে আমার মত 'অলস' ব্যক্তির পক্ষে খুব অল্প দিনের মধ্যে এই লেখার কাজটি হয়তো শেষ করা সম্ভব হত না।

গ্রন্থটি সমৃদ্ধ করতে আমার প্রাক্তন ছাত্র, হেয়ার স্কুলের শিক্ষক, শ্রী অনীত রায় কয়েকটি মূল্যবান ছবি দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। ধন্যবাদ দিয়ে তাকে ছোটো করবো না।

১২ জানুয়ারি, ২০০৯ **জ্যোতির্ভূষণ দত্ত**

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন

এইচ.ভি.হ্যাম্পটন তাঁর 'বায়োগ্রাফিকাল স্টাডিজ ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান এডুকেশন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ডেভিড হেয়ার নিজের সম্বন্ধে বলতেন,"An uneducated man friendly to education"। প্রকৃত পক্ষে 'পন্ডিত' বা 'শিক্ষিত' প্রভৃতি শব্দগুলি আমরা যে ধরণের মানুষের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করি, ডেভিড হেয়ার, ভারত বন্ধু, এই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিটি মোটেই সেরকম ছিলেন না। ১৮০০ সালে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি ঘড়ির ব্যবসা করতে কলকাতায় আসেন এবং ১০/১২ বছরের মধ্যে সেই সময়ে প্রায় একচেটিয়া এই ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর ধনদৌলত সংগ্রহ করেন। কিন্তু ১৮১৬ সালে ব্যবসা পত্র ছেড়ে দিয়ে এক সুতীব্র আগ্রহ এবং আন্তরিকতায় বঙ্গাদেশের মানুষ জনের শিক্ষার প্রসারের



রামধন স্বর্ণকার কর্তৃক অঙ্কিত ডেভিড হেয়ারের প্রতিকৃতি

লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি ভারতীয়দের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয়দের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য এবং ইউরোপিয় দর্শন ও

বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় করানো অত্যন্ত প্রয়োজন। ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষাকে তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন।

ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার শুরুতে সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত "সরল বাঙ্গালা অভিধান" -এর (২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯০৯) জীবনচরিত অংশে তাঁর যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে সেটি তথ্যগত মান্যতার স্বার্থে ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি ঃ

"ভারতের ইংরাজী ভাষার শিক্ষা প্রচলনে যে সকল ইংরেজ কায়মনো- বাক্যে উদ্যোগী ছিলেন, হেয়ার সাহেব তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৭৭৫ সালে স্কটল্যান্ডে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ঘড়ি নির্মাণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া ইনি ১৮০০ সালে কলকাতায় আসেন। অল্প দিনেই কিছু সংগতি করিয়া ১৯১৬ সালে এই কার্য্য গ্রে নামক এক আত্মীয়কে সমর্পণ করেন। ১৮১৪ সালে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কলিকাতায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে হেয়ার পরামর্শ করেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Edward Hyde East ও কতিপয় বাঙ্গালী বন্ধুর সহায়তায় ১৮১৭ সালে ২০শে জানুয়ারী হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৎসরেই বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রচার কল্পে ইনি 'School Book Socity' স্থাপন করেন। পুস্তকাদি প্রনয়নে রাজা রামমোহন রায় ইঁহাকে অনেক সাহায্য করেন। পর

বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ইঁনি আর একটি সমিতি স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজী ও বাংলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ইনি ও রাজা রাধাকান্ত দেব এই সমিতির সেক্রেটারী পদে আসীন ছিলেন। ইনি কেবল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না। ছাত্রগণের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতির উপর ইনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে বাড়িতে যাইয়া ইহাদের সংবাদ লইতেন। কথিত আছে, ইনি বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্য শেষ হইবার সময় দ্বারদেশে তোয়ালে হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং স্বহস্তে ছাত্রদিগের মুখ মুছিয়া দিতেন। ইনি যে বাড়িতে থাকিতেন, সেখানে কোন ছাত্র ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে ইঁহার বাড়ির সংলগ্ন একটি মিষ্টান্নের দোকানে তাহাদিগকে জলযোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। ছাত্রগণ ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং ইনিও পুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে স্নেহ যত্ন করিতেন। ইনি সংবাদপত্র বিষয়ক কঠোর আইন রদ করিবার পক্ষে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। যাহাতে মরিসস ও বুরবন উপনিবেশে ভারতীয়গণ যাইতে না পায় ও সুপ্রীম কোর্টে দেওয়ানী মকদ্দমা জুরি দ্বারা বিচারিত হয়, সে বিষয়েও ইনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

১৮৩৮ খ্রি. ইনি Court of Requests নামক আদালতে জজপদে অধিষ্ঠিত হন। এই আদালত এখন ছোটো আদালত নামে অভিহিত। ১৮৪২ খ্রিঃ ১ জুন ইনি বিসুচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন। কলকাতা গোল দিঘির



দু'জন ছাত্রসহ ডেভিড হেয়ারের প্রতিকৃতি—
শিল্পী চার্লস পোট (Pote)

এক কোণে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের অনেকেই

সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আজ পর্যন্ত প্রতি বৎসরের ১ জুন ইঁহার কবরের নিকট সমবেত হন। ইঁহার একটি প্রস্তরময়ী মূর্তি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে এবং যে বাড়িতে ইঁনি বাস করিতেন, সেই বাড়িতে স্মরণচিহ্ন স্বরূপ গভর্নমেন্ট একটি মর্মরফলক স্থাপিত করিয়াছেন। ছোট আদালতের দক্ষিণে যে রাস্তায় ইঁহার বাড়ি ছিল, সেই রাস্তাটি হেয়ার স্ট্রীট নামে বহুদিন যাবৎ অভিহিত আছে।"

ডেভিড হেয়ারের জন্ম ১৭৭৫ সালে স্কটল্যান্ডে এবং পঁচিশ বছর বয়সে ১৮০০ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। তারপর থেকে কলকাতা শহরে তাঁর ঘড়ির ব্যবসা এবং বঙ্গদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে তাঁর কর্মকাণ্ড এবং এখানে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও জীবনযাত্রা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের ইতিহাস— অর্থাৎ তাঁর শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের ঘটনাবলি, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রায় সবটাই আমাদের কাছে অজ্ঞাত। অধ্যাপক সুশোভন সরকারের এ সম্পর্কে মন্তব্য, ডেভিড হেয়ার নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে এত সংকোচ বোধ করতেন যে তাঁর পিতার নামটিও সকলের কাছে অজানাই রয়ে গেছে।

যাঁরা সভ্যতার অগ্রপথিক তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো ন্যায়-নীতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আদর্শবাদের বীজ বপন হয় শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম

যৌবনের নমনীয় ও উর্বর জমিনের স্বপ্নময় দিনগুলিতে। কিন্তু ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে আমাদের বিস্ময়, জীবনের উষালগ্নের কোন্ সে প্রেরণা— কোন্ সে প্রভাব যা তাঁর সমগ্র জীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে সক্রিয় হয়ে ছিল? যা উপ্ত না হলে মধ্য যৌবন থেকেই তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন সম্ভব হত না। যার অভাব থাকলে ডেভিড হেয়ারের মতো একজন বিদেশী সফল ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রায় সর্বত্যাগী ও মহান শিক্ষা সংস্কারক হিসেবে অভূতপূর্ব রূপান্তর সম্ভব হত না। কী সেই প্রেরণা যার প্রভাবে ডেভিড হেয়ারকে প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে? তাঁর জীবন সম্পর্কে এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে গবেষণার অবকাশ রয়ে গেছে।

তাঁর জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের ইতিহাস জানতে পারলে এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যেত। তবে এর উৎস সন্ধানে ডেভিড হেয়ারের জীবনের প্রথম ২৫ বছরের ব্যক্তিগত ঘটনাবলি ও তথ্যাদির অভাবে সমসাময়িক ইউরোপের পরিস্থিতি ও মতাদর্শগত পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনার সমারোহ লক্ষ্য করা যায়। যে ঘটনাগুলির ফলাফল ও প্রভাব ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পৃথিবীর দিকে দিকে সেই প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও তা ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল

ছিল এবং আধুনিক মানব সভ্যতা ও প্রগতির দিক্ নির্দেশ করেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে 'নব্যবঙ্গের দীক্ষা গুরু' হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের জন্মও হয়েছিল স্কটল্যান্ডে, ১৭৮৫ মতান্তরে ১৭৮৭ সালে। বলা হয় যে "তখন স্কটল্যান্ড ছিল নতুন ভাবনাচিন্তা ও বৈপ্লবিক স্বপ্নের জন্মভূমি। সংশয়, প্রতিবাদ, প্রকল্পনা তখন স্কটল্যান্ডের আকাশে বাতাসে। দার্শনিক হিউমের সংশয়বাদ, রবার্টসনের নতুন ইতিহাস চেতনা, রিড আর স্টুয়ার্টের যুক্তিশানিত আস্তিক্যবাদ, টমাস ক্যাম্পবেলের মুক্তিকামী কবিতা, রবার্ট বার্নসের বিদ্রোহী কাব্য-কথিকা, টম পেইনের যুক্তিবাদী দর্শন সংবেদনশীল যে কোন মানুষের চেতনার শিরায় শিরায় আগুন ছড়িয়ে দিত। হিউমের সংশয়বাদ, পেইনের 'এজ অব রিজন', ক্যাম্প-বেলের 'প্লেজার্স অব হোপ' আর বার্নসের আগুনের স্বপ্ন তাঁর মস্তিষ্ক আর হৃদয়কে দখল করে নিয়েছিল।" তাই ডেভিড ড্রামন্ড স্বপ্ন দেখেছিলেন নতুন ধরণের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ও সমাজ গড়ার এবং তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন ডিরোজিওর মতো শিক্ষক। মনে রাখতে হবে যে ডেভিড হেয়ারও স্কটল্যান্ডে জন্মেছিলেন সেই সময়ে (১৭৭৫ সালে) যখন সেখানে আধুনিক চিন্তা চেতনার জোয়ার বইছে।

দেশ ও পরিবেশের সাধারণ পরিচয়

অষ্টাদশ শতকে রেনেসাঁস সঞ্জাত যুক্তিবাদ ইউরোপের চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে গভীর ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই যুগে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির দ্বারা সব বিষয়ের কার্যকারণ বিচার করবার একটা প্রবণতা তীব্র হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সব ক্ষেত্রেই মানুষ যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে প্রচলিত ব্যবস্থা এবং ধ্যানধারণার সত্যাসত্য যাচাই করাকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। এই শতাব্দীতে ইউরোপের মানুষজনের কাছে ধর্মীয় আবেগ বা অন্ধবিশ্বাস নয়, যুক্তি ও বুদ্ধিই হয়ে উঠছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার, বিশেষত শিক্ষিত জনমানসে। তাই এই শতককে জ্ঞানদীপ্তির যুগ বলা হয়ে থাকে— যখন ইউরোপে চিন্তার জগতে Rationalism বা যুক্তিবাদের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যুক্তিবাদ থেকে আসে

মানবতাবাদ বা Humanism। সমাজের সব কিছুই মূল্যায়ন করা এবং পরিচালনা করা প্রয়োজন মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের নিরিখে— Man is the measure of all values, এই চিন্তাধারাই ছিল মানবতাবাদের মূল দিক্ নির্দেশ— জ্ঞানদীপ্তির প্রধান পথ সংকেত। এই জ্ঞানদীপ্তির মহত্তম প্রকাশ ঘটে অষ্টাদশ শতকের ২য় ও ৩য় পর্বে অর্থাৎ ১৭৪৮ থেকে ১৭৮৯ সালে। এই সময় যে সব দার্শনিক তাঁদের মানবতাবাদী ও যুক্তিভিত্তিক চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ফরাসী দার্শনিক ভল্‌তেয়ার ও রুশোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রেনাল ও অন্যান্য লেখকেরা ওই সময়ের দার্শনিক মতবাদকে সহজভাষার মাধ্যমে জনসমাজে প্রচার করেন। এই আলোকিত দর্শনের দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ। এদের মধ্যে ছিল আইনজীবী, শিক্ষক, চাকুরিয়া ও বণিক সম্প্রদায়। যুক্তিবাদের প্রচারের ফলে পাপ ও ঈশ্বর সম্পর্কে লোকের পূর্ব-প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন হতে শুরু করে। মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়— সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করা সম্পর্কে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়। লেখা পড়ার চর্চা যত বৃদ্ধি পায় আলোকিত দর্শনের প্রভাব তত ব্যাপক হয়। ব্যবসাদার পরিবারের সন্তান ডেভিড হেয়ার ইউরোপের এই জ্ঞানদীপ্তির ধ্যান ধারণা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং সে সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন, এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী ঘটনা ফরাসী বিপ্লব। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে যে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল সেটা অবশ্যই কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন যাবৎ ফরাসী রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে যে ব্যবস্থা চলছিল সেটা ফ্রান্সের বৃহত্তম জনসমষ্টির স্বার্থের অনুকূল ছিল না। ফ্রান্সের উদিয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষেও রাজন্যবর্গ, অভিজাত শ্রেণী ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্যে পরিচালিত তৎকালীন ফরাসী সমাজ অসম্মানজনক ও স্বার্থবিরোধী ছিল। এরই ফলশ্রুতিতে ফ্রান্সের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষজন বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠন করতে তৎপর হয়। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপর মন্তেস্কু, ভলতেয়ার এবং রুশোর দার্শনিক তত্ত্বের প্রভাব বিশেষ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং জনমত সৃষ্টি ও জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লবের বিখ্যাত শ্লোগানটি "স্বাধীনতা সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব" (Liberty, Equality and Fraternity) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতে শুরু করে।

ইউরোপের এই গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রভাব ডেভিড হেয়ারের কৈশোর এবং যৌবনের শুরুতে কতখানি পড়েছিল এবং কীভাবে তার সূত্রপাত ঘটেছিল সেটা ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। কিন্তু যেভাবেই হোক এই প্রেরণার বীজ তাঁর মধ্যে উপ্ত হয়েছিল— এটা অনুমান করা সঙ্গত মনে করি। তবে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন

যে ওই সময়ে ইউরোপের কোন দেশেই সর্বজনীন শিক্ষার প্রচলন হয়নি।

অন্যদিকে অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ডেভিড হেয়ার কলকাতায় আসার ২৫/৩০ বছর পূর্বে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব এবং কুসংস্কার বিরাজ করছিল। ইংরেজ শাসকবৃন্দও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। ইংরেজের তাঁবেদার মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ে কলকাতায় দাপিয়ে বেড়াত। ওই সময়ে কলকাতার অবস্থা কেমন ছিল সেটা বোঝার জন্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৬৯৮ এর ১০ নভেম্বর ইংরেজরা সাবর্ণ চৌধুরিদের কাছ থেকে মাত্র তেরোশো টাকার বিনিময়ে সুতানটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতা এই তিনটি গ্রাম কিনেছিল। এই তিনটে গ্রাম থেকেই আজকের কলকাতা গড়ে উঠেছে। এখানকার লালদিঘির পশ্চিম পাড়ে ছিল সাবর্ন চৌধুরিদের কাছারি। গোটা তল্লাটে ওই একটাই পাকা বাড়ি ছিল। গোবিন্দপুরে তখন শেঠ ও বসাকদের বাস ছিল। বণিক বলতে তারাই ছিল প্রধান এবং ব্যবসার সূত্রে তাদের সাথে ইংরেজদের খাতির হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষেরা ভাগ্যের সন্ধানে নবদ্বীপে নিজেদের গ্রাম বারোপাড়া ছেড়ে গোবিন্দপুরে চলে আসেন। পঞ্চানন কুশারী সেই বংশের ছেলে। তাঁর কাজ ছিল ইংরেজদের জাহাজে মালপত্র ওঠানো ও নামানোতে সাহায্য করা এবং খাবার জোগাড় করে দেওয়া। তাঁর কর্মচারিরা সবাই

তথাকথিত নীচুজাতের লোক ছিল। তারা তাদের মনিব পঞ্চানন কুশারীকে ঠাকুর মশাই হিসেবে সম্বোধন করতো। এইভাবে সকলের মুখে মুখে পঞ্চানন কুশারী হয়ে গেলেন পঞ্চানন ঠাকুর। পঞ্চানন ঠাকুরের ছিল দুইটি পুত্র জয়রাম ও রামসন্তোষ। ১৭৪২ সালে যখন কলকাতায় জরীপের কাজ শুরু হয়, এঁরা দুজন আমিনের কাজ পেয়ে গেলেন এবং এর ফলে এঁদের পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে উঠল।

জয়রাম ঠাকুরের তিন ছেলে নীলমণি, দর্পনারায়ণ এবং গোবিন্দরাম। এই তিন ভাই বাড়ি করেছিলেন পাথুরেঘাটায়। পরবর্তীকালে ভায়ে ভায়ে বিবাদের ফলে নীলমণি ঠাকুর পাথুরেঘাটার বাড়িঘর বিক্রি করে বিখ্যাত শেঠ পরিবারের বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে ১ বিঘা জমি কিনে ১৭৮৪ সালে জোড়াসাঁকোতে নতুন করে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করেন। এইভাবে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ির পত্তন হল। উল্লেখ্য যে শেঠেদের পূর্বপুরুষ বৈষ্ণবচরণ শেঠের ছিল গঙ্গাজলের ব্যবসা। শিলমোহর করা তাঁর গঙ্গাজল চালান যেত দেশবিদেশে। বসাক পরিবারের মধ্যে তখন বিখ্যাত ছিলেন শোভারাম বসাক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দালালি করেই এঁদের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। দালালরা কমিশন পেত সামান্য— টাকায় আধ পয়সা। কিন্তু উপরি আয়ের অনেক চোরাপথ ছিল। পুরোনো কলকাতার সঙ্গে জনৈক সুবর্ণ বণিক রাজারাম মল্লিক এবং তাঁর দুই

পুত্র দর্পনারায়ণ ও সন্তোষ মল্লিকের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। এই মল্লিক পরিবারের ছেলে বিখ্যাত নিমাইচরণ মল্লিক যাঁর চলতি নাম নিমু মল্লিক। অগাধ সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি। বলাই বাহুল্য কোম্পানির সুনজরের প্রসাদেই মল্লিকদের এই বাড়বাড়ন্ত ঘটেছিল। বড়বাজার অঞ্চলে কোম্পানির জমিদারিতে রাজারাম বিনা খাজনায় বাস করতেন।

পুরোনো কলকাতার আরও কয়েকজন বিত্তবানের নাম উল্লেখ করা যায়। ক্লাইভের আমল থেকেই কলকাতা বস্তুত দুভাগে বিভক্ত। একদিনে বাঙালিদের পাড়া। সেটা ইংরেজদের ভাষায় নেটিভ টাউন। আর অন্যদিকে ইংরেজদের পাড়া, সেটা হোয়াইট টাউন। নেটিভ টাউনের বড়োলোকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুতানুটির মহারাজা রাজবল্লভ, চড়কভাঙার (এখন যেটা নতুন বাজার এলাকা হিসেবে পরিচিত) মহারাজ নন্দকুমারের ছেলে রাজা গুরুদাস, পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবার ছাড়া ছিলেন মল্লিকরা, আর আন্দুল রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান রামচরণ। পাইক পাড়ায় থাকতেন হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং এবং কান্তাবাবু। অগাধ অর্থের মালিক এবং স্বনামধন্য দাতা গৌরী সেন থাকতেন বড়বাজার অঞ্চলে। ওই অঞ্চলে শেঠ ও বসাকরাও বসবাস করতেন। কলকাতার ধনকুবের হিসেবে খ্যাত রামদুলাল দে থাকতেন সিমলা অঞ্চলে। কুমোরটুলির মিত্র, শ্যামবাজারের বসু এবং কলুটোলার শীলেদেরও ধনবান হিসেবে খুব নামডাক ছিল।

হেস্টিংসের আমল থেকে কলকাতা বাংলার রাজধানী। তাই ওই সময় থেকেই প্রকৃত পক্ষে কলকাতার বাড়-বাড়ন্ত। নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, রাস্তায় পালকীর বদলে এসেছে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, গ্যাসের আলো, পাকা বাড়ি, কলের জল, টানা পাখার হাওয়া। এতসব নতুন জিনিষ পত্রের আকর্ষণে এবং রুজি রোজগারের টানে অনেক মানুষ বিভিন্ন গ্রাম ও গঞ্জ থেকে কলকাতায় ছুটে এল। কারণ কলকাতায় চাকরি, ব্যবসা অথবা দালালি কিছু একটা জুটে যাবেই। সৎ এবং অসৎ পথে পয়সা রোজগারের অনেক পথ। ১৭৮০ সালে ১ কাঠা জমির দাম ছিল কুমোরটুলিতে ১১ টাকা, সিমলা অঞ্চলে ১০ টাকা এবং বাগবাজারে ২৫ টাকা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাভাবিক নিয়মে জমির দাম বেড়েছে। উনিশ শতকের গোড়ায়, ডেভিড হেয়ার তখন কলকাতায় বসবাস করছেন, ধর্মতলা কিংবা বউবাজার অঞ্চলে ১ কাঠা জমির দাম বেড়ে হয়েছিল দুশো থেকে আড়াইশো টাকা। পাকা বাড়ির সংখ্যা এবং জমির দাম যত বাড়তে লাগল, ততই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষজন অর্থাৎ জেলে, তাঁতি, শাঁখারিরা শহর থেকে উৎখাত হয়ে শহর থেকে দূরে যেতে শুরু করল। কলকাতা শহর হয়ে উঠল ধনী ব্যবসায়ীদের শহর। কলুটোলা, আহিরীটোলা, কুমোরটুলি, দর্জিপাড়া, মুচিপাড়া, কাঁসারীপাড়া, কসাইটোলা, শাঁখারীটোলা প্রভৃতি নামগুলির মধ্যে রয়ে গেল কলকাতার পুরোনো বাসিন্দাদের বসবাসের ইতিহাস।

আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ, কলকাতার সমাজ জীবন বাবু, নব বাবুদের কীর্তিকলাপে রগরগে জীবনযাত্রায় কল্লোলিত। "পূজো-আচ্চা, বিয়ে-শ্রাদ্ধ, দোল-দুর্গোৎসব, বাৎসরিক ক্রিয়াকর্ম, এমন কি গঙ্গাযাত্রার শোকাবহ মুহূর্তেও এই 'বাবু'রা আমোদ প্রমোদের ফোয়ারা ছোটাতেন হরিলুটের মতো অর্থের অপব্যয় ঘটিয়ে। এরই সমান্তরালে আড়ম্বরময় জীবনযাপন, বাঈজি নাচ, বাগানবাড়ি ও বেশ্যালয়ে রাত্রিযাপন, নৌবিহার, মাইফেল, বুলবুলির লড়াই, কুকুর-বেড়ালের বিয়ে, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রতিযোগিতা, গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, বহুমূল্য আতর দিয়ে বাড়ি ধোয়ানো, মুক্তাভস্ম দিয়ে পান খাওয়া প্রভৃতি ছিল সেকালের বড়োলোকদের খেয়াল খুশি। এই সব বাবু নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ও অন্যের উপরে টেক্কা দিতে গিয়ে কী ভীষণভাবে অর্থের অপচয় করেছেন তা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। এঁদের অর্থের লড়াই, বৈভব-প্রতিপত্তির লড়াই-এর দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাক।

একটি পারিবারিক উৎসব ছিল রাধাকান্ত দেবের পূর্বপুরুষ নবকৃষ্ণ দেবের রাজবাড়িতে। নিমন্ত্রিত হয়েছেন চূড়ামনি দত্তের পরিবারবর্গ ও। রাজবাড়ির সেদিনের পারিবারিক উৎসবের আয়োজন ছিল বিপুল। এক সপ্তাহ আগেই উঠোনে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। সুদৃশ্য সামিয়ানার মাঝখানে বিরাট ঝাড়লণ্ঠন। চারপাশের খুঁটিতে

অপূর্ব কারুকার্য করা বাতিদান। সেদিনের উৎসব ছিল রাজবাড়ির মেয়েদের উৎসব। শুধুমাত্র মহিলা আত্মীয়-পরিজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। বেশ জাঁকজমক করে মূল্যবান পোষাক অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে পালকি চড়ে লোক-লস্কর নিয়ে এসেছেন চূড়ামনি দত্তের বাড়ির মেয়েরা। রাজবাড়িতে দেখা যাচ্ছে মূল্যবান পোষাক আর অলঙ্কারের প্রতিযোগিতা। শ্বেতশুভ্র সামিয়ানার নিচে অভ্যাগতদের বসবার আসন। চূড়ামনি দত্তের বাড়ির মহিলারা আসনে বসতেই হঠাৎ দেখা গেল শ্বেতশুভ্র সামিয়ানার রং পালটে গেছে। সমস্ত মণ্ডপটাই যেন ময়ূরকণ্ঠী রং ধারণ করেছে। সবাই চমকে গেল— সামিয়ানার রং এমন করে হঠাৎ পালটে গেল কেন? মণ্ডপে এসে দাঁড়ালেন মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব। তাঁরও চোখ বিস্ময়ভরা। এমন চোখ-জুড়ানো ময়ূরকণ্ঠী রঙের মেলা এর আগে তো তিনি কখনও দেখেননি। ঠিক সেই মুহূর্তে চূড়ামনি দত্তের মেয়ে সুরমা এগিয়ে এল মহারাজের দিকে। মহারাজ সুরমাকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই বুঝতে পারলেন ময়ূরকণ্ঠী রঙের রহস্যটা। সুরমার আঙুলে বিরাট এক মূল্যবান পাথর বসানো আংটি। মহারাজ হতবাক, এত বড়ো নীলকান্ত মণি পেল কোথায় চূড়ামণি। নীলকান্ত মণির আংটির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে তীব্র জ্বালা মেশানো আছে এ বোধ সুরমার ছিল। কারণ সে চূড়ামনিরই মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই সে দেখেছে এই দু'বাড়ির অর্থ-গর্বের প্রতিযোগিতা। আংটিটি দেখে

আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ, কলকাতার সমাজ জীবন বাবু, নব বাবুদের কীর্তিকলাপে রগরগে জীবনযাত্রায় কল্লোলিত। "পূজো-আচ্চা, বিয়ে-শ্রাদ্ধ, দোল-দুর্গোৎসব, বাৎসরিক ক্রিয়াকর্ম, এমন কি গঙ্গাযাত্রার শোকাবহ মুহূর্তেও এই 'বাবু'রা আমোদ প্রমোদের ফোয়ারা ছোটাতেন হরিলুটের মতো অর্থের অপব্যয় ঘটিয়ে। এরই সমান্তরালে আড়ম্বরময় জীবনযাপন, বাঈজি নাচ, বাগানবাড়ি ও বেশ্যালয়ে রাত্রিযাপন, নৌবিহার, মাইফেল, বুলবুলির লড়াই, কুকুর-বেড়ালের বিয়ে, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রতিযোগিতা, গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, বহুমূল্য আতর দিয়ে বাড়ি ধোয়ানো, মুক্তাভস্ম দিয়ে পান খাওয়া প্রভৃতি ছিল সেকালের বড়োলোকদের খেয়াল খুশি। এই সব বাবু নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ও অন্যের উপরে টেক্কা দিতে গিয়ে কী ভীষণভাবে অর্থের অপচয় করেছেন তা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। এঁদের অর্থের লড়াই, বৈভব-প্রতিপত্তির লড়াই-এর দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাক।

একটি পারিবারিক উৎসব ছিল রাধাকান্ত দেবের পূর্বপুরুষ নবকৃষ্ণ দেবের রাজবাড়িতে। নিমন্ত্রিত হয়েছেন চূড়ামনি দত্তের পরিবারবর্গ ও। রাজবাড়ির সেদিনের পারিবারিক উৎসবের আয়োজন ছিল বিপুল। এক সপ্তাহ আগেই উঠোনে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। সুদৃশ্য সামিয়ানার মাঝখানে বিরাট ঝাড়লণ্ঠন। চারপাশের খুঁটিতে

অপূর্ব কারুকার্য করা বাতিদান। সেদিনের উৎসব ছিল রাজবাড়ির মেয়েদের উৎসব। শুধুমাত্র মহিলা আত্মীয়-পরিজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। বেশ জাঁকজমক করে মূল্যবান পোষাক অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে পালকি চড়ে লোক-লস্কর নিয়ে এসেছেন চূড়ামনি দত্তের বাড়ির মেয়েরা। রাজবাড়িতে দেখা যাচ্ছে মূল্যবান পোষাক আর অলঙ্কারের প্রতিযোগিতা। শ্বেতশুভ্র সামিয়ানার নিচে অভ্যাগতদের বসবার আসন। চূড়ামনি দত্তের বাড়ির মহিলারা আসনে বসতেই হঠাৎ দেখা গেল শ্বেতশুভ্র সামিয়ানার রং পালটে গেছে। সমস্ত মণ্ডপটাই যেন ময়ূরকণ্ঠী রং ধারণ করেছে। সবাই চমকে গেল—সামিয়ানার রং এমন করে হঠাৎ পালটে গেল কেন? মণ্ডপে এসে দাঁড়ালেন মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব। তাঁরও চোখ বিস্ময়ভরা। এমন চোখ-জুড়ানো ময়ূরকণ্ঠী রঙের মেলা এর আগে তো তিনি কখনও দেখেননি। ঠিক সেই মুহূর্তে চূড়ামনি দত্তের মেয়ে সুরমা এগিয়ে এল মহারাজের দিকে। মহারাজ সুরমাকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই বুঝতে পারলেন ময়ূরকণ্ঠী রঙের রহস্যটা। সুরমার আঙুলে বিরাট এক মূল্যবান পাথর বসানো আংটি। মহারাজ হতবাক, এত বড়ো নীলকান্ত মণি পেল কোথায় চূড়ামণি। নীলকান্ত মণির আংটির সঙ্গো প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে তীব্র জ্বালা মেশানো আছে এ বোধ সুরমার ছিল। কারণ সে চূড়ামনিরই মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই সে দেখেছে এই দু'বাড়ির অর্থ-গর্বের প্রতিযোগিতা। আংটিটি দেখে

মহারাজের মধ্যে যে অন্তর্দাহের তীব্র জ্বালা শুরু হয়েছে, সুরমা বেশ বুঝতে পারল। রাত্রে নেমন্তন্ন রক্ষা করে বাড়ি ফিরে এসে সুরমা তার বাবার কাছে সব ঘটনা বলল। মহারাজকে এক আংটিতেই ধরাশায়ী করা গেছে, এ কথা ভেবে চূড়ামনি আহ্লাদে আটখানা। পরদিন সকালে মহারাজের অন্তর্দাহ বৃদ্ধি করার জন্য চূড়ামনি দত্ত একটি সুদৃশ্য পাত্রে ভরে নীলকান্ত মণির আংটিটি মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবকে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে পাঠালেন একটি চিঠি তাতে লেখা, "আমার নিকট বেশকিছু সংখ্যক এই রূপ নীলকান্ত মণি থাকায় এবং আপনি পূর্বে এই রূপ মণি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই জানিয়া এই লক্ষাধিক অর্থমূল্যের অঙ্গুরীয়টি আপনাকে দান করিলাম। আশা করি কোনও রূপ অনুগ্রহ না করিয়াই এদান গ্রহণ করিবেন।"

কলকাতার জমিদার-শ্রেণির মধ্যে কুমোরটুলির মিত্র পরিবার ছিল বেশ ডাকসাইটে। এই বংশেরই খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন অভয়চরণ মিত্র। তাঁর কুলগুরু প্রায়ই আসতেন কলকাতায় শিষ্যদের বাড়ি। কলকাতায় এলেই অন্যতম প্রধান ভক্ত ও শিষ্য অভয়চরণের বাড়িতেও তিনি আসতেন। গুরুদেব একবার কথায় কথায় অভয়চরণকে বললেন, বৎস অভয়চরণ, আমি এত বনেদি পরিবারের গুরু, কিন্তু আমি একসঙ্গে কখনও লাখ টাকা দেখিনি। আমার একটি বার একসঙ্গে লক্ষ টাকা দেখতে ইচ্ছে করে। গুরুদেবকে প্রণাম করে অভয়চরণ বললেন, আমাকে

সাতদিন সময় দিন। সাতদিন পর গুরুদেব অভয়চরণের বাড়ি এলেন। উপযুক্ত সেবাযত্নের পর অভয়চরণ গুরুদেবকে নিয়ে এলেন একটা দরজাবন্ধ ঘরের সামনে এবং গুরুদেবকে বললেন, আপনি এই চাবি দিয়ে ঘরের তালাটা খুলুন। অভয়চরণের হাত থেকে চাবি নিয়ে ঘরের তালা খুললেন গুরুদেব। দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গুরুদেবের চক্ষু চড়কগাছ। ঘরের মধ্যে একটা বড়ো টেবিলের ওপর সোনা-রূপার স্তূপ। অভয়চরণ স্মিত হাস্যে বললেন, দেখুন গুরুদেব, একসঙ্গো লাখ টাকা নয়, লাখ লাখ টাকা। অভয়চরণ আবার বললেন, গুরুদেব এ সবই আমি আপনাকে সশ্রদ্ধ উপহার হিসেবে দান করলাম। গুরুদেব এই অভাবনীয় ঘটনায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। মাথাটা তাঁর ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪ সালে অর্থাৎ ডেভিড হেয়ারের জন্মের এক বছর পূর্বে রামমোহনের জন্ম। তিনি ১৮১৪ সালে কলকাতা নগরে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। সুতরাং ডেভিড হেয়ার এবং রামমোহন সমসাময়িক। সে সময় কলকাতার সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, আর কতদূর অন্ধকার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে রামমোহনের মতো সমাজ সংস্কারকদের লড়াই করতে হয়েছে তার কিছু চিত্র রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পাওয়া যায়।

"রামমোহন রায় যে সময়ে কলকাতায় আসিয়া

উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমন্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রাহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না। কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে ও মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ ও অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পূণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না।... বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে তো কোনো প্রকার বিদ্যার চর্চা ছিল না। চলিত বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক, কাহারও বর্ণশুদ্ধির জ্ঞান ছিল না, বিষয় কর্মের উপযোগী পত্রলেখা ও অঙ্ক জানা থাকিলেই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট হইত।... বুলবুলি ও ঘুড়ির খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বিন সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল...।"

এই সময়ের সামাজিক অবস্থার এরকম আর একটি বর্ণনা দিয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ "শহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অর্থ-সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার

বিষয় ছিল না। বরং কোন সুহৃদগোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত।... যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমানে ইংরেজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত।... কোন ধনী কোন প্রসিদ্ধ বাইজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ শহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত ও কেহই তাহাকে তত দোষাবহ করিতেন না, এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্যলাভের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।... এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়েছিল, তাহারা ফারসী ও স্বল্প ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বাহিরাকৃতি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। মুখে, ভ্রুপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালোপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানি ও পায়ে পুরু বকলেস সমন্বিত চিনে বাড়ির জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাফ আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারা-

ঙ্গানাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত, এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গানাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।...”

“এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিৎ পরে শহরে গাঁজা খাওয়াটা এত প্রবল হইয়াছিল যে শহরে স্থানে স্থানে এক একটা বড়ো গাঁজার আড্ডা হইয়াছিল।”

কলকাতা শহরে ব্যাপকভাবে ছিল শোচনীয় অজ্ঞতা, দুর্নীতি, অপদার্থতা, জড়ত্ব, ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার। গ্রামেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল সামন্ততান্ত্রিক শোষণের চরম অবস্থা, কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং অলস জীবনযাত্রা। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতারা শিশু কন্যাকেও মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দিয়ে পুণ্যলাভের চেষ্টা করত। বিয়ে করাকে কুলীন ব্রাহ্মণেরা একটা জাত ব্যবসা হিসেবে কাজে লাগাত। প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে তারা অসংখ্য বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি ঘুরে ঘুরে জীবিকা নির্বাহ করত। এর মূল কারণ অর্থনৈতিক এবং সেই সঙ্গে ব্যাপক অশিক্ষা। কোন্ সময় থেকে বাংলা দেশে বহুবিবাহ, বালবিবাহ এবং সহমরণ প্রভৃতি অমানবিক প্রথা বিস্তার লাভ করে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে অর্থনৈতিক ভাঙনের সঙ্গে যে এগুলি জড়িত তা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজদের শোষণের ফলে বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে অতি দ্রুত ভাঙন শুরু

হয়। পূর্বের শাসন ব্যবস্থার অবসান এবং নতুন শাসন ব্যবস্থা পত্তনের মাঝে গ্রামের কৃষকের ওপর ইংরেজ বণিকের শোষণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গ্রাম্য সমাজের ভাঙনের সাথে সাথে অশিক্ষা ও সামাজিক দুর্নীতিও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলা বাহুল্য, বিদেশি ইংরেজদের শোষণের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় দেশি জমিদার বা ভূস্বামীদের শোষণ-পীড়ন ও স্বেচ্ছাচার।

বঙ্গাদেশের এইরকম একটা অবস্থায় সমাজ সেবা এবং মূখ্যত শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে ডেভিড হেয়ারের আবির্ভাব। প্রসঙ্গাত বনফুল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কৃষ্ণ ধরের লেখা তিনটি কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

।। ডেভিড হেয়ার ।।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালোবেসে আত্মীয়ের মত
জ্বেলেছিলে শুভ্র দীপ, শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে
জনমি খ্রীষ্টানকুলে খ্রীষ্ট নামে তরাতে তরিতে
চাহ নাই, তাই তো নাস্তিক তুমি নর-সেবাব্রত।
অর্থদানে মুক্তপানি, বিদ্যাদানে অতন্দ্র নিয়ত,
আর্ত্তের ছাত্রের বন্ধু, ছিলে পটু মানুষ গড়িতে
স্নেহবিত্ত চিত্ত দানে, নব্যবঙ্গো—বিকল ঘড়িতে
বিনি মূলে কল-বল নিত্য তুমি জোগায়েছ কত।
কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ,—
তবুও নাস্তিক তুমি। — ও অস্থি নেবে না গোরস্থান।

তাই ছাত্র-পল্লী-তলে বিরাজিছ ছাত্রের দেবতা।
সমাধা— সমাধি সেথা পবিত্র ব্রতের যেথা সুরু।
ছাত্র-পরাম্পরা স্মরে পুণ্য তব জীবনের কথা—
মনুষ্যত্ব-ধর্মে পূত-হে নাস্তিক। আস্তিকের গুরু।

।। ডেভিড হেয়ার ।।

বনফুল

ডেভিড হেয়ার আমাদের দেশে
ঘড়ির দোকান করেছিলেন এসে
আবিষ্কার করলেন অবশেষে
এ দেশেতে মানুষ ঘড়িই বিকল।
কেউ স্লো, কেউ ফাস্ট, কেউ বা নিশ্চল
কারো নেই কাঁটা
কেউ বা স্প্রিং-কাটা।
ভেবে চিন্তে করলেন তিনি তাই
মানুষ-ঘড়ি-তৈরি-করার নূতন কারখানাই।
হেয়ার স্কুল সে কারখানার নাম
হে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, তোমাকে প্রণাম।

।। ডেভিড হেয়ার ।।

কৃষ্ণ ধর

ছিল শুধু ভালবাসা, প্রতিদান চাওনি কিছুই
দেশান্তর থেকে এসে এদেশের জেনেছো আপন।
ছিল না বর্ণ-দ্বেষ, মুক্তমন সংস্কার বিহীন

মমতায় কাঁদত প্রাণ, আর্তকে ডেকে নিতে ঘরে
সস্নেহ সেবার জন্য, গৃহহীন পেয়েছে আশ্রয়।
তোমার জীবন-ব্রত যেন এক দীপশিখা জ্বেলে
অন্ধকার দূর করে ভেঙেছিল বাংলার ঘুম।
অজ্ঞতার রুদ্ধদ্বার দুই হাতে তুমি খুলে দিয়ে
আমাদের পুব দেশে নিয়ে এলে পশ্চিমের হাওয়া
নতুন প্রাণের ছন্দে জেগেছিল বাংলার মাটি।
ডাক দিয়ে গেছ তুমি, এই নাও জ্ঞানের আলোক
মুক্তির এ চাবিকাঠি, সেই জন্য তুমি মহামতি,
বাংলার রেণে সাঁসে এনেছিলে প্রাণের আশ্বাস
তোমাকে স্মরণ করি, তুমি আছ দীপ্ত ইতিহাস।

(উপরিউক্ত কবিতা তিনটি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত 'ডেভিড হেয়ার দ্বিশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ' থেকে সংগৃহীত।)

বংশ, পিতা ও মাতার পরিচয় ও জন্মস্থান

ডেভিড হেয়ার স্কটল্যান্ডবাসী ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৭৭৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। স্কটল্যান্ডের আবার্ডিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যদিও তাঁর বাবা এবং মায়ের নাম কী ছিল তা জানা সম্ভব হয়নি। ডেভিড হেয়ারের জীবনীকার প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব স্কটল্যান্ডের জনৈক মি. রাস্ট সাহেবের কাছ থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি নিম্নরূপ :

ডেভিড হেয়ারের পিতা লন্ডনে ঘড়ি তৈরির ব্যবসা করতেন। তিনি স্কটল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত আবার্ডিনের জনৈক মহিলাকে বিবাহ করেন। ডেভিড হেয়ার ভারতবর্ষে আসার পূর্বে মাত্র একবার আবার্ডিনে গিয়েছিলেন— উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মায়ের আত্মীয়স্বজনদের সাথে পরিচিত হওয়া। ডেভিড হেয়ারের ভাই ছিল তিনজন— যোশেফ লন্ডনে ঘড়ির ব্যবসা করতেন এবং সেখানে ৪৮ নং

বেডফোর্ট স্কোয়ারে-এ বহুদিন বসবাস করেছেন। অন্য ভাই আলেকজান্ডার, তিনি ডেভিড হেয়ারের পরে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এখানেই প্রয়াত হন। আলেকজান্ডারের কন্যার নাম জেনেৎ। তৃতীয় ভাই এর নাম জন। তিনিও ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু এখান থেকে লন্ডনে ফিরে যান এবং ভাই যোশেফের সাথে বসবাস করেন। সেখানেই তিনি মারা যান। তাঁর কন্যার নাম রোস্যালিন্ড। সিডমার্ডথের জনৈক ডা. বি. হোজের সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

ডেভিড হেয়ার সম্ভবত লন্ডনে তাঁর পিতার কাছ থেকেই ঘড়ি তৈরি সংক্রান্ত কাজকর্ম শিখেছিলেন।

প্যারীচাঁদ রচিত হেয়ারের জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা রামমোহনের মৃতদেহ সমাহিত করার সময় হেয়ারের তিন ভাই সমাধিস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রামমোহনের মরদেহ সমাহিত করার সময় যে সাক্ষ্যপত্র রচিত হয় তাতে ডেভিড হেয়ারের ভাই যোশেফ, জন এবং জেনেৎ হেয়ারের স্বাক্ষর আছে। কিন্তু জেমসের স্বাক্ষর অনুপস্থিত। সুতরাং অনুমান করা যায় যে জেমস হেয়ার এই নামে কোন ভাই তাঁর ছিল না। মিস্ কার্পেন্টার-এর লেখা 'Last Days in England of Raja Ram Mohan Roy' এই পুস্তকে মৃত্যুর পূর্বে রামমোহনের শুশ্রুষাকারিনী জনৈক নারীকে ডেভিড হেয়ারের কন্যা বলা হয়েছে। ডেভিড অবিবাহিত ছিলেন, উক্ত নারী জেনেৎ, তাঁর ভ্রাতুপুত্রী ছিলেন। পূর্বোক্ত মি. রাস্টের মতে জেনেৎ

আলেকজান্ডার হেয়ারের কন্যা ছিলেন। কলকাতায় আর্মানি গির্জাশিখরের বড়ো ঘড়িটি ১৭৮৯ সালে লন্ডনে ঘড়ি ব্যবসায়ী আলেকজান্ডার হেয়ারের কাছ থেকে কেনা হয়। এই আলেকজান্ডার হেয়ারই ডেভিড হেয়ারের অগ্রজ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে ডেভিড হেয়ার ১৮০০ সালে ভারতে আসেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮০০ সালের ১৫ ডিসেম্বর তিনি পোর্টসমাউথ বন্দর থেকে মর্নিংউন জাহাজে যাত্রা করে ১৮০১ সালের ৪ঠা মে ডায়মন্ড হারবারে অবতরণ করেন। কলকাতার পুরোনো ডাইরেকটরিতে দেখা যায় যে হেয়ার ১৮০১ সালে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮২০ সালের ১ জানুয়ারি হেয়ার ঘড়ির ব্যবসা তাঁর কর্মচারি মি. গ্রের নিকট বিক্রি করে দেন।

হেয়ার প্রথমে কলকাতার লার্কিনস্ লেনে তাঁর ঘড়ির দোকান খোলেন। পরে তাঁর ঠিকানা দেখা যায় ১৫ নং হেয়ার স্ট্রিট। ১৮২৪ থেকে ১৮৪২ এ মৃত্যুকাল পর্যন্ত কলকাতার পুরোনো ডাইরেকটরিতে ডেভিড হেয়ারকে ৪ নং হেয়ার স্ট্রিটের আবাসিক হিসেবে দেখানো হয়েছে। মি. গ্রে-ও ওই বাড়িতেই থাকতেন। হেয়ার নিজের বসবাসের জন্য অন্য একটি বাড়ি প্রস্তুত করেন। কিন্তু এই বাড়ি নির্মাণ করতে তাঁর অনেক দেনা হয়। বাড়ি নির্মাণ শেষ হলে তিনি সেটি বিক্রয় করে দেন এবং ঋণ পরিশোধ করেন। বর্তমানে Small cause Court এর বিপরীতে মেটকাফ হল সংলগ্ন যে বৃহৎ পুরান অট্টালিকাটি ২ নং

চার্চ লেন হিসেবে চিহ্নিত সেটিই উক্ত হেয়ার নির্মিত বাড়ি।

বর্তমান কালের হেয়ার স্ট্রিট রাস্তাটি ডেভিড হেয়ারের জীবনদ্দশাতেই, সম্ভবত ১৮২৪ সালে, তাঁর নামে ভূষিত হয়েছিল। পূর্বে এই রাস্তাটি পশ্চিমে বর্তমান Small cause Court পর্যন্ত Tank square নামে পরিচিত ছিল। Strand Road পর্যন্ত পরের অংশটি ফাঁকাই ছিল। কলকাতা লটারি কমিটি ওই রাস্তাটি Strand Road পর্যন্ত প্রসারিত করে Hare Street এই নামকরণ করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলকাতা লটারি কমিটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Calcutta Improvement Trust এর মত কলকাতার রাস্তা ঘাট নির্মাণের দায়িত্বে ছিল।

আলেকজান্ডার হেয়ারের কন্যা ছিলেন। কলকাতায় আর্মানি গির্জাশিখরের বড়ো ঘড়িটি ১৭৮৯ সালে লন্ডনে ঘড়ি ব্যবসায়ী আলেকজান্ডার হেয়ারের কাছ থেকে কেনা হয়। এই আলেকজান্ডার হেয়ারই ডেভিড হেয়ারের অগ্রজ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে ডেভিড হেয়ার ১৮০০ সালে ভারতে আসেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮০০ সালের ১৫ ডিসেম্বর তিনি পোর্টসমাউথ বন্দর থেকে মর্নিংউন জাহাজে যাত্রা করে ১৮০১ সালের ৪ঠা মে ডায়মন্ড হারবারে অবতরণ করেন। কলকাতার পুরোনো ডাইরেকটরিতে দেখা যায় যে হেয়ার ১৮০১ সালে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮২০ সালের ১ জানুয়ারি হেয়ার ঘড়ির ব্যবসা তাঁর কর্মচারি মি. গ্রের নিকট বিক্রি করে দেন।

হেয়ার প্রথমে কলকাতার লার্কিনস্ লেনে তাঁর ঘড়ির দোকান খোলেন। পরে তাঁর ঠিকানা দেখা যায় ১৫ নং হেয়ার স্ট্রিট। ১৮২৪ থেকে ১৮৪২ এ মৃত্যুকাল পর্যন্ত কলকাতার পুরোনো ডাইরেকটরিতে ডেভিড হেয়ারকে ৪ নং হেয়ার স্ট্রিটের আবাসিক হিসেবে দেখানো হয়েছে। মি. গ্রে-ও ওই বাড়িতেই থাকতেন। হেয়ার নিজের বসবাসের জন্য অন্য একটি বাড়ি প্রস্তুত করেন। কিন্তু এই বাড়ি নির্মাণ করতে তাঁর অনেক দেনা হয়। বাড়ি নির্মাণ শেষ হলে তিনি সেটি বিক্রয় করে দেন এবং ঋণ পরিশোধ করেন। বর্তমানে Small cause Court এর বিপরীতে মেটকাফ হল সংলগ্ন যে বৃহৎ পুরান অট্টালিকাটি ২ নং

চার্চ লেন হিসেবে চিহ্নিত সেটিই উক্ত হেয়ার নির্মিত বাড়ি।

বর্তমান কালের হেয়ার স্ট্রিট রাস্তাটি ডেভিড হেয়ারের জীবনদ্দশাতেই, সম্ভবত ১৮২৪ সালে, তাঁর নামে ভূষিত হয়েছিল। পূর্বে এই রাস্তাটি পশ্চিমে বর্তমান Small cause Court পর্যন্ত Tank square নামে পরিচিত ছিল। Strand Road পর্যন্ত পরের অংশটি ফাঁকাই ছিল। কলকাতা লটারি কমিটি ওই রাস্তাটি Strand Road পর্যন্ত প্রসারিত করে Hare Street এই নামকরণ করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলকাতা লটারি কমিটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Calcutta Improvement Trust এর মত কলকাতার রাস্তা ঘাট নির্মাণের দায়িত্বে ছিল।

বিষয়-সম্পত্তি ও শিক্ষা-দীক্ষা

ডেভিড হেয়ার ১৮০০ সাল নাগাদ যখন কলকাতায় ঘড়ির ব্যবসা শুরু করেন তখন সেখানে বহু ধনী ব্যবসায়ী ও ভূসম্পত্তির মালিকদের বসবাস গড়ে উঠেছে। নতুন জিনিস ঘড়ির জন্য তাই প্রচুর চাহিদা ছিল। এটা অনুমান করা যেতে পারে, এই অবস্থায় প্রায় একচেটিয়া ঘড়ির ব্যবসা করে হেয়ার প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

ডেভিড হেয়ারের বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে তিনি ১৮২০ সালে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাঁর ঘড়ির ব্যবসা মি. গ্রে-কে বিক্রয় করেন। সেই সময়ে এক লক্ষ টাকা অনেক টাকা— অধিকাংশ মধ্যবিত্তের মাসিক রোজগার পাঁচ টাকা অথবা তার সামান্য কিছু বেশি ছিল। উক্ত এক লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে হেয়ার জমি-জমা কেনা বেচার ব্যবসায় যুক্ত হন এবং বহু অর্থ উপার্জন করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে

যে বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি বর্তমানের হেয়ার স্ট্রিটে একটি বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। এই বাড়িটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কলকাতা লটারি কমিটির কাছ থেকে প্রায় ৩৯,০০০ টাকার বিনিময়ে কিছুটা জমি ক্রয় করেছিলেন। পাশের অন্য একটি বাড়ির জমি সংগ্রহের জন্যও তাঁর প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। আমাদের দেশের শিক্ষা বিস্তার ও বহু জনহিতকর কাজের জন্য তাঁর বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। সম্ভবত একটা সময়ে জমি বেচা কেনার ব্যবসাতেও তাঁর বেশ কিছু টাকা লোকসান হয় এবং গচ্ছিত কিছু টাকা কোন কারণে নষ্ট হয়। এই সব কারণে শেষ জীবনে হেয়ার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন এবং এক সময়ে তিনি ঋণ মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নব নির্মিত বাড়িটি বিক্রয় করে তিনি ঋণ পরিশোধ করেন। ১৮৪০ সালে কোর্ট অব রিকোয়েস্টের তৃতীয় জজ (কমিশনার) নিযুক্ত হওয়ার পর ডেভিড হেয়ারের আর্থিক সংকট অনেকটাই কেটে যায়। কারণ ওই পদের বেতন ছিল মাসিক এক হাজার টাকা। জীবনের শেষের দু বছর তিনি ওই কাজে যুক্ত ছিলেন। হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর বিষয় সম্পত্তির কী অবশিষ্ট ছিল তা জানা যায় না তবে কথিত আছে যে টি.ই.এম.টার্টান নামের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবীর ওপর হেয়ারের ধনসম্পত্তি বিলি ব্যবস্থার ভার অর্পিত হয়েছিল।

ডেভিড হেয়ারের শিক্ষা-দীক্ষা কেমন ছিল সে সম্পর্কে

বিষয়-সম্পত্তি ও শিক্ষা-দীক্ষা

ডেভিড হেয়ার ১৮০০ সাল নাগাদ যখন কলকাতায় ঘড়ির ব্যবসা শুরু করেন তখন সেখানে বহু ধনী ব্যবসায়ী ও ভূসম্পত্তির মালিকদের বসবাস গড়ে উঠেছে। নতুন জিনিস ঘড়ির জন্য তাই প্রচুর চাহিদা ছিল। এটা অনুমান করা যেতে পারে, এই অবস্থায় প্রায় একচেটিয়া ঘড়ির ব্যবসা করে হেয়ার প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

ডেভিড হেয়ারের বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে তিনি ১৮২০ সালে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাঁর ঘড়ির ব্যবসা মি. গ্রে-কে বিক্রয় করেন। সেই সময়ে এক লক্ষ টাকা অনেক টাকা—অধিকাংশ মধ্যবিত্তের মাসিক রোজগার পাঁচ টাকা অথবা তার সামান্য কিছু বেশি ছিল। উক্ত এক লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে হেয়ার জমি-জমা কেনা বেচার ব্যবসায় যুক্ত হন এবং বহু অর্থ উপার্জন করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে

যে বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি বর্তমানের হেয়ার স্ট্রিটে একটি বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। এই বাড়িটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কলকাতা লটারি কমিটির কাছ থেকে প্রায় ৩৯,০০০ টাকার বিনিময়ে কিছুটা জমি ক্রয় করেছিলেন। পাশের অন্য একটি বাড়ির জমি সংগ্রহের জন্যও তাঁর প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। আমাদের দেশের শিক্ষা বিস্তার ও বহু জনহিতকর কাজের জন্য তাঁর বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। সম্ভবত একটা সময়ে জমি বেচা কেনার ব্যবসাতেও তাঁর বেশ কিছু টাকা লোকসান হয় এবং গচ্ছিত কিছু টাকা কোন কারণে নষ্ট হয়। এই সব কারণে শেষ জীবনে হেয়ার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন এবং এক সময়ে তিনি ঋণ মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নব নির্মিত বাড়িটি বিক্রয় করে তিনি ঋণ পরিশোধ করেন। ১৮৪০ সালে কোর্ট অব রিকোয়েস্টের তৃতীয় জজ (কমিশনার) নিযুক্ত হওয়ার পর ডেভিড হেয়ারের আর্থিক সংকট অনেকটাই কেটে যায়। কারণ ওই পদের বেতন ছিল মাসিক এক হাজার টাকা। জীবনের শেষের দু বছর তিনি ওই কাজে যুক্ত ছিলেন। হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর বিষয় সম্পত্তির কী অবশিষ্ট ছিল তা জানা যায় না তবে কথিত আছে যে টি.ই.এম.টার্টান নামের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবীর ওপর হেয়ারের ধনসম্পত্তি বিলি ব্যবস্থার ভার অর্পিত হয়েছিল।

ডেভিড হেয়ারের শিক্ষা-দীক্ষা কেমন ছিল সে সম্পর্কে

দুটি বিপরীত ধর্মী মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ তাঁকে অশিক্ষিত বা অতি সাধারণ শিক্ষিত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফ্ হেয়ার সম্পর্কে এই ধরণের মত ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপ মতামত মুদ্রিত হয়েছে ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া পত্রিকায়— "An individual without any refinement of education and without intellectual endowments". হেয়ার নিজেকে বলতেন "An uneducated man friendly to education"। কিন্তু তথ্যাদি প্রমাণ করে যে প্রথম দুটি মন্তব্য অসত্য ও ঈর্ষা প্রসূত এবং হেয়ারের বক্তব্যটি বিনয়ের অভিব্যক্তি। হিন্দু কলেজ, স্কুল সোসাইটি, স্কুলবুক সোসাইটি এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত অসংখ্য চিঠিপত্র ও প্রতিবেদন তাঁকে লিখতে হয়েছে। এই সব নথিপত্রে তাঁর ইংরেজি ভাষার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব দায়িত্বপূর্ণ পদে এবং কোর্ট অব রিকোয়েস্ট-এর জজের পদে নিয়োগের সময় গভর্নর জেনারেল বেন্টিং ও লর্ড অকল্যান্ড নিশ্চয় তাঁকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিহীন শুধু একজন ঘড়ির ব্যবসায়ি হিসেবে গণ্য করেননি। সরকারি শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদের অধিকারী কার সাহেবের মতেও হেয়ার ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনেকের রচনার সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই উন্নতমানের সাধারণ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। The general committee of Public Instruction নামীয় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হোরেস্ হেম্যান

উইলসন ১৮২৯ সালে স্কুলবুক সোসাইটিকে নির্দেশ প্রদান করেন যে তাঁরা যেন নতুন ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের সময় বিশেষভাবে হেয়ারের পরামর্শ গ্রহণ করেন। হেয়ারের জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে আস্থা না থাকলে তিনি অবশ্যই এই ধরণের নির্দেশ দিতেন না।

সেযুগে এশিয়াটিক সোসাইটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হত। ১৮২৮ সালে হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৮৩৩ সালে তিনি সোসাইটির 'কমিটি অব পেপারস্'-এর সদস্য হন। উচ্চশিক্ষাযুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরাই এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হতে পারতেন। প্রায় নয় বছর হেয়ার এই কমিটির সদস্য ছিলেন। হেয়ার উচ্চমানের শিক্ষার অধিকারী ছিলেন, এ প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন— হেয়ার ২৫ বছর বয়সে ভারতে আসার পূর্বে ইংল্যান্ডের বহু সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকতেন, এই তথ্য পাওয়া গেছে। যে যুবক ইংল্যান্ডে সেই সময়ে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে যাওয়া-আসা করতেন তাঁর শিক্ষা ও চিন্তা চেতনার স্তর যে উচ্চ মানের ছিল, এটা বলাই বাহুল্য।

হেয়ারের শিক্ষাগত মান সম্পর্কে আরও দুই একটি তথ্য বিশেষভাবে প্রনিধান করা প্রয়োজন। ইউরোপীয় সমাজে হেয়ারের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন সেই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী লঙ্গোভিল ক্লার্ক, লীথ, টার্টান। তদানীন্তন কালে ভারতীয়দের মধ্যে প্রজ্ঞায় এবং

শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী ছিলেন রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই সব ব্যক্তিদের সাথেও হেয়ারের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং এঁদের সাথে সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম এবং শিক্ষার সংস্কার সংক্রান্ত কর্মসূচি বিষয়ে হেয়ারের বহুবিধ আলোচনা হয়েছে এবং সেইসব ক্ষেত্রে তিনি তাঁর উন্নতমানের চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৩৫ সালে ৫ জানুয়ারি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নিতে সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক ছাড়া ডেভিড হেয়ারও মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

এই সব তথ্য প্রমাণ থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হেয়ার হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করেননি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং অগ্রবর্তী চিন্তা, জ্ঞান ও মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। সম্পূর্ণ মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমাদের দেশে শিক্ষার মর্মবাণী অনুধাবন করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদ বা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

ভারতের আধুনিক শিক্ষা প্রসারে বিদেশী পথিকৃৎ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে তাঁর বাল্যকালে পিতামহ মাঝে মাঝে সংস্কৃত ও ফরাসি ভাষার কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। তার মধ্যে ছন্দবিহীন কিছু অপ্রচলিত ছড়াও ছিল। এদের অন্যতম একটি ছড়া নিম্নরূপ :

"জ্যোন্সঃ কেরী তথা হ্যারঃ
প্রিন্‌সেপশ্চ কনিংঘমঃ।
পঞ্চ গৌরান্ স্মরেণ্ নিত্যং
জ্ঞানাঞ্জন-প্রদায়কান্"।।

এই ছড়াটির মধ্যে পাঁচ জন গোরা বা সাহেবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তাঁরা আমাদের জ্ঞানের অঞ্জন বা কাজল পরিয়েছেন। এই পাঁচ জনের

একজন হেয়ার। অন্য চারজন উইনিয়াম জোন্স্, উইনিয়াম কেরি, ড. জেমস প্রিন্সেপ এবং আলেকজান্ডার ক্যানিং-হাম। বলাই বাহুল্য যে আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতিসাধনে এই পাঁচজন ইউরোপবাসীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। এঁরা একাধারে অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী এবং ভারতপ্রেমী ছিলেন। আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ হিসেবে এঁদের সকলেই সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। ভারতবাসীকে বন্ধ ঘরের দরজা-জানালা খুলে আধুনিকতার আলোর সাথে এঁরা পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। যদিও আধুনিক শব্দটি আপেক্ষিক-প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয় আধুনিকতার সংজ্ঞা। কিন্তু ইতিহাসের তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে আধুনিকতার একটি মাপকাঠি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইউরোপের দেশগুলিতে তুর্কিদের হাতে কন্সট্যান্টিনোপলের পতন। কন্স্ট্যানটিনোপল ছিল খ্রিস্টানদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঘাটি। ১৪৫৩ সালে তার পতনের পর ওখানকার বিদ্বৎজন পালিয়ে পশ্চিম ইউরোপে বসবাস করতে শুরু করেন। এর ফলে ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক নবদিগন্ত খোলে। ১৪৫৪ সালে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটাল। ১৪৫৩ সালে এবং তার পরবর্তী সময়কে আধুনিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারত তখন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় এবং কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। চিন্তা চেতনায় যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান মনস্কতার নিদারুণ অভাব ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে ১৭০৭ সালে

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময়কে ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান হিসেবে গণ্য করা হয়। নতুন যুগ বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি, নতুন ধরণের সামাজিক মূল্যবোধ, নতুন রাজনৈতিক চিত্র, নতুন মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করল। পরবর্তী সময়ে মূলত ইউরোপিয় মিশনারীরা মধ্যযুগীয় শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটাতে শুরু করেছিল। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি এবং ইংরেজ বণিকেরা ভারতে আসতে শুরু করল। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া ধর্মপ্রচার এবং তার সহায়ক হিসেবে শিক্ষাকে তারা ব্যবহার করেছিল ভারতে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে। পর্তুগিজ জলদস্যুদের অপরাধমূলক কাজকর্ম ভারতে পর্তুগীজদের অবস্থান বিপন্ন করে তোলে এবং ভারতীয়দের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা দ্রুত গতিতে হ্রাস পায়। যদিও কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, জেসুইট কলেজ, থিওলজিকাল কলেজ, প্রিন্টিং প্রেসের ব্যবহার এবং মূখ্যত ফ্রান্সিস জেভিয়ারের ভূমিকা ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্তুগীজদের অবদান আমাদের স্মরণ করায়। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ডাচদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। এরপর ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মূলত মাহে, কারিকল, পন্ডিচেরি, মাদ্রাজ ও চন্দননগরে ফরাসিদের উন্নত সংস্কৃতি ও শিক্ষাচিন্তার প্রভাব পড়ে।

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইংরেজ

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত করল। যদিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে ভারতে শিক্ষার কোন দায়িত্ব নেয়নি কিন্তু ওই কাজে নিযুক্ত মিশনারীদের প্রথম দিকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করতেন। তবে তাদের মধ্যে এই পারস্পরিক সুসম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বুঝে ছিল যে মিশনারীদের শিক্ষার সাথে খ্রিস্টধর্মের নিবিড় সম্পর্ক থাকার কারণে ওদের প্রতি ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরি হতে পারে এবং ভারতীয়দের ধর্মীয় আবেগ আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে। তাই তারা মিশনারীদের কার্যকলাপের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করল। অতঃপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরাসরি ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করল প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত তারা শিক্ষার মাধ্যমে অভিজাত ভারতীয়দের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে মনোযোগী হল। দ্বিতীয়ত শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তাদের প্রয়োজন হল ইংরেজি জানা ভারতীয় কর্মচারির। ইংরেজ শাসকরা মূলত এই দুটি উদ্দেশ্যে এবং মিশনারিরা ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গানে প্রবেশ করেছিল। এক্ষেত্রে কিছু ইউরোপিয়ান ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন ন্যাথানিয়েন ব্র্যাসি হ্যালহেড্। বাংলা ব্যাকরণের জনক হিসেবে উনি স্মরণীয়। ১৭৭৮ সালে তিনি 'এ গ্রামার অব বেঙ্গালি ল্যাঙ্গুয়েজ' প্রকাশ করেন। তিনি গীতা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থেরও ইংরেজি অনুবাদ

করেছিলেন। এছাড়া চার্লস উইলকিন্স, ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যার উইনিয়াম জোন্স এবং উইলিয়াম কেরি, মার্শমান ও ওয়ার্ড (যাঁদের শ্রীরাম ত্রয়ী হিসেবে সকলে চেনেন), রেভারেন্ড মে, আলেকজান্ডার ডাফ, ডেভিড হেয়ার, জে.ই.ভি. বেথুন, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, রেভ উইলিয়াম অ্যাডাম, আনি বেসান্ত এবং লর্ড কার্জন-এর নামও এ'প্রসঙ্গো স্মরণ করা প্রয়োজন।

চার্লস উইলকিন্স : তাঁর সংস্কৃত ভাষার পান্ডিত্যের জন্য তিনি প্রথম ইউরোপিয়ান পন্ডিত হিসেবে অভিহিত হয়েছিলেন। তিনি মহাভারত ও গীতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের কাজে তিনি প্রথম বাংলা হরফ ব্যবহার করেন। তাঁকে বাংলা প্রকাশনার পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংস : নানা কারণে তিনি দুর্নাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাঁর প্রচেষ্টাতেই কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয় এবং বহু বছর তাঁর ব্যক্তিগত অর্থ থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতো। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইনের 'আইন-ই-আকবরি' প্রকাশের ক্ষেত্রে হেস্টিংস তাঁকে সাহায্য করেন এবং হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের সময়ও তিনি চার্লস উইলকিন্সকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

স্যার উইলিয়াম জোন্স : এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। দাসত্ব প্রথা

উচ্ছেদ ও সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান ভূমিকা ছিল।

শ্রীরামপুর ত্রয়ী : উইলিয়াম কেরি ১৭৯৯ সালে শ্রীরামপুরে আধুনিক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রথম বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। ১৮০০ সাল থেকে তিনি মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সাথে একত্রে শিক্ষাপ্রসারের কাজে নিযুক্ত হন। ১৮০১ সালে তাঁদের সাথে যোগদান করেন রামরাম বসু। মাতৃভাষাই শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম, এই সত্য তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় কলকাতা, শ্রীরামপুর এবং অন্যান্য স্থানে ছেলে-মেয়ে উভয়ের শিক্ষার জন্য প্রায় ১১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলার বাইরে আগ্রা, দিল্লি, সিম্‌লা, আরাকান, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানেও তাঁরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁরা নর্মাল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ভারতে মেয়েদের আধুনিক শিক্ষাপ্রদানের উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তাঁরাই প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮২১ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৮ সালে তাঁরা শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন করেন। প্রাচ্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উভয়ই এই কলেজের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই কলেজে ভরতির ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের কোনো বাধা ছিল না। বিভিন্ন দেশের মূল্যবান গ্রন্থে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার এবং শ্রীরামপুর প্রেস প্রতিষ্ঠা শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অনবদ্য অবদান।

এই প্রেস থেকেই ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হল প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' এবং পরে 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকা। কেরি বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট' বাংলায় অনুবাদ করেন এবং ১৮১৫ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে আশি হাজার শব্দে সমৃদ্ধ পাঁচ খণ্ডের 'অ্যাংলো বেঙ্গালি ডিক্‌শনারি' প্রকাশ করেন।

রেভারেন্ড মে : পঠন, লিখন ও গণনের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৮১৪ সালে চুঁচুড়ায় তাঁর নিজের বাড়িতে প্রথম দেশিয় বিদ্যালয় খোলেন। প্রথম বিদ্যালয় খোলার এক বছরের মধ্যে তিনি হুগলী নদীর দুধারে ১৫টি স্কুল গড়ে তোলেন। ১৮১৮ সালে তিনি মেয়েদের জন্যও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে কম বয়সী বালিকাদের সাথে বয়স্কা মহিলারাও পঠনপাঠনের সুযোগ পেতেন। তিনি ছিলেন লন্ডন মিশনারী সোসাইটির প্রতিনিধি।

আলেকজানজার ডাফ : কলকাতায় আসেন ১৮৩০ সালে। ইনি স্কটিশ মিশনের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৮৩০ সালেই তিনি 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিস্‌ ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৭ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় স্কটিশ চার্চ কলেজের বর্তমান ভবনটি নির্মিত হয়। কলকাতা ও কলকাতার বাইরে তিনি একাধিক দেশিয় ভাষার প্রাথমিক স্কুল এবং মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেন। সাধারণ শিক্ষার সাথে ধর্মবোধের শিক্ষাকে তিনি যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

জে.ই.ভি.বেথুন : নিজের খরচে ১৮৪৯ সালে ধর্মনিরপেক্ষ একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর উইলে নিজের সম্পত্তি সব স্কুলটিকে দান করে যান। বর্তমানের বেথুন স্কুল এবং বেথুন কলেজ তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহিলা স্কুল থেকেই গড়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালংকার, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও : হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন ভারতে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের স্রষ্টা এবং কুসংস্কার মুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক যুগের পথপ্রদর্শক। হিন্দু কলেজে তিনি ইংরেজি ও ইতিহাস পড়াতেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর মতবাদের পরিণতি হিসেবে তৎকালীন সমাজপতিদের চক্রান্তে হিন্দু কলেজের চাকুরি থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। তাঁর সুযোগ্য ছাত্ররা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত এবং এঁরাই ছিলেন ঊনবিংশ শতকে বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রধান অগ্রপথিক।

রেভ উইনিয়াম অ্যাডাম : ভারতীয় শিক্ষা এবং তার উন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি একাধিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। এই প্রতিবেদনগুলির মধ্যে বহু পরামর্শ উন্নত ভাবনায় সমৃদ্ধ এবং অনেকাংশে আজও আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সেই সময়কালে গভর্নর লর্ড

বেন্টিংকের সাথে তাঁর শিক্ষা ভাবনার পার্থক্য ঘটায় উক্ত সুপারিশগুলি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

আনি বেসান্ত :১৮৯০ সালে ভারতে আসেন। ভারতে তিনি সমাজসেবা এবং রাজনৈতিক কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাতে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, ভারতীয়দের জাতীয় চেতনার উন্মেষের স্বার্থে তাঁদের অবশ্যই নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতিতে আগ্রহী করা প্রয়োজন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহযোগিতায় বেনারসে 'সেন্ট্রাল হিন্দু স্কুল' স্থাপন করেন— পরবর্তীকালে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ভারতে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে তিনি তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

লর্ড কার্জন : ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করার ইংরেজদের অপচেষ্টার সাথে এই নামটি জড়িত থাকায় কার্জনের শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগ সম্পর্কে তৎকালীন ভারতীয়রা সন্দিহান ছিল। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বহু অবদান বিশেষভাবে ইতিবাচক ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অধিক অর্থ বরাদ্দ, মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির সংস্কার, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য প্রদান, স্নাতকোত্তর স্তরের

জে.ই.ভি.বেথুন : নিজের খরচে ১৮৪৯ সালে ধর্মনিরপেক্ষ একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর উইলে নিজের সম্পত্তি সব স্কুলটিকে দান করে যান। বর্তমানের বেথুন স্কুল এবং বেথুন কলেজ তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহিলা স্কুল থেকেই গড়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালংকার, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও : হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন ভারতে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের স্রষ্টা এবং কুসংস্কার মুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক যুগের পথপ্রদর্শক। হিন্দু কলেজে তিনি ইংরেজি ও ইতিহাস পড়াতেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর মতবাদের পরিণতি হিসেবে তৎকালীন সমাজপতিদের চক্রান্তে হিন্দু কলেজের চাকুরি থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। তাঁর সুযোগ্য ছাত্ররা 'ইয়ং বেঙ্গাল' নামে পরিচিত এবং এঁরাই ছিলেন ঊনবিংশ শতকে বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রধান অগ্রপথিক।

রেভ উইনিয়াম অ্যাডাম : ভারতীয় শিক্ষা এবং তার উন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি একাধিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। এই প্রতিবেদনগুলির মধ্যে বহু পরামর্শ উন্নত ভাবনায় সমৃদ্ধ এবং অনেকাংশে আজও আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সেই সময়কালে গভর্নর লর্ড

বেন্টিংকের সাথে তাঁর শিক্ষা ভাবনার পার্থক্য ঘটায় উক্ত সুপারিশগুলি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

আনি বেসান্ত :১৮৯০ সালে ভারতে আসেন। ভারতে তিনি সমাজসেবা এবং রাজনৈতিক কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাতে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, ভারতীয়দের জাতীয় চেতনার উন্মেষের স্বার্থে তাঁদের অবশ্যই নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতিতে আগ্রহী করা প্রয়োজন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহযোগিতায় বেনারসে 'সেন্ট্রাল হিন্দু স্কুল' স্থাপন করেন— পরবর্তীকালে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ভারতে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে তিনি তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

লর্ড কার্জন : ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করার ইংরেজদের অপচেষ্টার সাথে এই নামটি জড়িত থাকায় কার্জনের শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগ সম্পর্কে তৎকালীন ভারতীয়রা সন্দিহান ছিল। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বহু অবদান বিশেষভাবে ইতিবাচক ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অধিক অর্থ বরাদ্দ, মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির সংস্কার, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য প্রদান, স্নাতকোত্তর স্তরের

পঠনপাঠন ও গবেষণায় গুরুত্ব দান, শিক্ষা প্রশাসন সংগঠিত করার জন্য শিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্য আমরা লর্ড কার্জনের কাছে ঋণী।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এই সব বিদেশী ব্যক্তির অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে ডেভিড হেয়ারের নাম অবশ্যই একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে স্মরণ করতে হবে। এর কারণ একাধিক। প্রথমত ডেভিড হেয়ার ছাড়া ভারতীয় শিক্ষার উন্নতি কল্পে যে সকল ইউরোপীয়ান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা কেউ খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে শিক্ষাকে গণ্য করেছিলেন এবং ধর্মীয় স্বার্থ পূরণ করাই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যদের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয়দের ওপর ইংরেজি প্রশাসন কায়েম করা অথবা ইউরোপিয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয়দের মনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করা। দ্বিতীয়ত অন্যেরা ছিল প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের বা প্রশাসনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

ডেভিড হেয়ার ছিলেন সামান্য ঘড়ির ব্যবসায়ি। সেক্ষেত্রে শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশের জন্য যে শিক্ষাগত মান্যতা, সামাজিক, প্রশাসনিক অথবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা থাকার প্রয়োজন হয়, সেটা তাঁর ছিল না। তাঁর ছিল ভারতীয়দের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সমাজ সেবার তীব্র বাসনা। সেই সঙ্গে ছিল বস্তুনিষ্ঠ সমাজচেতনা। তিনি সঠিক ভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে বেনারস সংস্কৃত কলেজ,



হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৮-১৮৩১)

কলকাতা মাদ্রাসা এবং মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা-এই সব ক্ষেত্রের প্রধান নিয়ামক ছিল ধর্ম। ধর্মীয় শিক্ষাকে তিনি প্রয়োজনীয় মনে করতেন না। ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে ভারতীয়দের মাতৃভাষা ও ইংরেজি উভয় ভাষার শিক্ষা প্রদান করাই ছিল তাঁর শিক্ষা ভাবনার মূল উদ্দেশ্য। তিনি

মনে করতেন যে ভারতীয়রা তাঁদের ভাষা ও উন্নত প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে যেমন পরিচিত হবে সেইসঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সাথেও তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সেই সময়ের কুসংস্কারগ্রস্ত অলস ভারতীয় জনগোষ্ঠি ও বিকৃত ইউরোপিয় জীবনযাপনের প্রতি মোহগ্রস্ত ভারতীয়দের মুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে শিক্ষাকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষার উন্নতি কল্পে ডেভিড হেয়ারের অবদান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদারের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিয়ে এই বিষয়টি শুরু করা যেতে পারে :

"A careful perusal of the activities of Hare would convince one that Hare was not a theoretician, nor an idle visionary. He was a practical idealist and saw clearly that what was badly needed for the Indians of his times was a balanced harmony of vernacular education and English education. Himself a highly cultured and sensitive mind, Hare never allowed himself to be dragged into any controvery. He kept himself away from the controversy between the Anglicists and the

Orientalists on the question as to what was the most suitable system of education for Indians. Likewise, he did not take any side in the controversy as to whether the members of 'Young Bengal were corrupted by Henry Derozio (1809-1831). Hare was an admirer of Derozio, the teacher, for the later's approach to education was, according to Hare, scientific, he despised cramming and urged his students to develop a spirit of enquiry and sharpen their critical faculty of reasoning. ..... Hare dedicated his life to the sacred task of promoting both Vernacular and English education throughout the country. Nevertheless his predilection was in favour of vernacular education, for, he sincerely believed that it was absolutely necessary to translate some major works on western thought and culture into the Bengalee's own language and for this purpose a sound vernacular education was imperative. It was for this reason that Hare nurtured, most tenderly, the free vernacular school at Arpuli as also the Hindu Vernaculon school (Hindu College Pathsala) whose foundation stone was laid by him near the Hindu College on June 14, 1837."

শিক্ষায় ডেভিড হেয়ারের অবদান প্রসঙ্গে অধ্যাপক মজুমদারের আরও একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"He realized the evil consequences of Babu Culture and deprecated the Indian youth's mad pursuit of Western life. Nevertheless, his attitude was not that of a fault-finder. When he exposed the emptiness of the mode of life led by the Indian youths, he had the fullest sympathy for them and he spared no pains to find out the contour of a balanced life. With unerring insight Hare saw that education and education alone would produce cultivated minds and bring about material progress as well as moral upliftment. In his hiararchy of values, Hare gave education the topmost position."

ডেভিড হেয়ার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা হবে ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মনে করতেন যে শিক্ষাকে মানুষের নৈতিক মানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষা কখনই নীতি-নৈতিকতা বা মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হতে পারে না। হেয়ার আদর্শবাদী এবং মানবপ্রেমী ছিলেন কিন্তু পারিপার্শ্বিক সমাজ বাস্তবতাকে তিনি উপেক্ষা করতেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল— সব ভাবনাচিন্তার ইতিবাচক এবং সামাজিক দিক থেকে

প্রয়োজনীয় ও বাস্তবসম্মত উপাদানগুলি গ্রহণ করতে চেষ্টা করতেন। তাই সেই সময়ের প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল দলের নেতা, যথাক্রমে রাজা রামমোহন ও রাধাকান্ত দেব, দুজনেই হেয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী হয়েছিলেন। কিন্তু কোন দলই হেয়ারকে কোন সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করতে পারেনি। রামমোহনের 'আত্মীয়সভা', ডিরোজিও-র 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'ইয়ং বেঙ্গাল'-এর সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সাথে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি সমন্বয়পন্থী বাস্তববাদী শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। সে যুগে ভারতে শিক্ষার বিষয় ও ভাষা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী দুটি মতবাদ সক্রিয় ছিল। এক পক্ষ ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের স্বপক্ষে সরব ছিলেন। এঁদের 'Anglicists' বলা হত। অপর পক্ষ মাতৃভাষাতেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের সমর্থক ছিলেন এবং প্রাচ্যভাষা ও প্রাচ্য বিদ্যা চর্চাকে গুরুত্ব দিতেন। এঁরা 'Orientalists' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হেয়ার এ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চা এই উভয় বিষয়কেই তিনি মূল্যবান মনে করতেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রাথমিক পাঠের উপযোগী পুস্তকাদি তখন ছিল না। চৈতন্য-চরিতামৃত, মনসামঙ্গাল, ধর্মগান, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ- মহাভারত, অন্নদামঙ্গাল এবং বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি বাংলা বইগুলিই ছিল তখনকার দিনে প্রচলিত। কিন্তু এগুলির মাধ্যমে বিদ্যালয়স্তরে পঠনপাঠন সম্ভব ছিল না।

হেয়ার সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংরাজি ও মাতৃভাষা দুটোই শিক্ষা দেওয়া জরুরি। তাই সাবলীল ইংরেজি ও মাতৃভাষায় লিখিত পঠনপাঠনের উপযোগী পুস্তকাদি সরবরাহ করা একান্ত অপরিহার্য বলে হেয়ার মনে করেছিলেন এবং সে ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম অগ্রপথিক ডেভিড হেয়ার প্রকৃত পক্ষে ঊনিশ শতকে বঙ্গ দেশে শিক্ষাবিস্তারের মহৎ যজ্ঞে বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরী।

নির্দ্বিধায় বলা যায় যে "হিন্দু কলেজের আদি কল্পক ডেভিড হেয়ার। তাঁরই অর্থে আরপুলি পাঠশালা স্থাপিত হয়। সিমলা পাঠশালা ও পটলডাঙ্গা স্কুলের পুরোপুরি বা আংশিক পরিচালকও ছিলেন তিনি। কলকাতা স্কুল সোসাইটির সাধারণ পাঠশালাগুলির উন্নতি করেই হেয়ার সাহেব ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব আরপুলি পাঠশালায় কয়েকটি সুন্দর নিয়ম তৈরি করেছিলেন। যেমন, আট বছর বয়স না হলে কেউ ইংরেজি পড়তে পারবে না। ছাত্ররা যাতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় তার জন্য তিনি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ যে জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটির মালিক ছিলেন হেয়ার। এ দেশে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর শেষ কপর্দক তিনি দান করে গেছেন।"

ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে ভারতবর্ষের মানুষজনের সার্বিক উন্নতি হবে এবং তাঁরা পরিপূর্ণ ও

সুখী মানুষ হবার পথের সন্ধান পাবে, একথা হেয়ার উপলব্ধি করেছিলেন। এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য হেয়ারের আত্মনিবেদনের মূল তাগিদ এই উপলব্ধি থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বলেছেন, "A few years after my arrival in this country, I was enabled to discover during my intercourse with several gentle men, that nothing but education was requisite to render the Hindus happy, and I exerted my humble abilities to further the interests of India..."

১৮১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। কলকাতার পাঠশালাগুলির মান উন্নয়ন এবং ভারতবর্ষের মানুষজনের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিস্তার করাই ছিল সোসাইটির উদ্দেশ্য। বলা যেতে পারে যে সোসাইটি হিন্দু কলেজের পশ্চাৎভূমি বা ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করত। সোসাইটি-নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলির দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীরা সোসাইটির অর্থানুকূল্যে হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করতে পারত। সোসাইটির স্কুলের অনেক ছাত্র পরবর্তীকালে ডিরোজিওর শিষ্য হিসেবে কৃতি হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামতনু লাহিড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হেয়ারের ব্যক্তিগত সাহায্যে ও সোসাইটির আর্থিক অনুদানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান। ১৮২৬ সালে ১৬৬টি স্কুল সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত অথবা নিয়ন্ত্রিত হত। হেয়ার কলকাতা স্কুল সোসাইটি

প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮২১ সালে ডেভিড হেয়ার সোসাইটির দেশী পাঠশালা বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ বছরেই সোসাইটির ইউরোপিয় সম্পাদক W.H.Pearce অসুস্থ হন এবং পদত্যাগ করেন। হেয়ার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং আমৃত্যু ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্কুল সোসাইটির কার্যবিবরণী থেকে জানতে পারি যে হেয়ারের ব্যক্তিগত আংশিক বা পুরোপুরি দায়িত্বে তিনটি স্কুল ছিল— সিমলা পাঠশালা ও আরপুলি পাঠশালা হেয়ারের ব্যয়ে পরিচালিত হত, পটলডাঙ্গা স্কুল প্রথমে হেয়ার ও পরে সোসাইটির অর্থে পরিচালিত হত। যেসব অভিভাবকবৃন্দ বেতন দিতে অক্ষম ছিলেন আরপুলি পাঠশালা তাঁদের সন্তানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী সশ্রদ্ধায় উল্লেখ করেছেন—

'মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড়ো বিবেচ্য বিষয়'— কবি পোপের এই উক্তি হেয়ার নিজের জীবনে রূপায়িত করেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শণ করতেন, ছাত্রদের মায়ের মত স্নেহ করতেন এবং সর্বদা দরিদ্র বালক ও তাদের অভিভাবকদের দ্বারা পরিবৃত থাকতেন। দরিদ্র বালকেরা তাঁর নিকট থেকে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করত, অথচ জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়ে

হেয়ার-এর গৃহে জল স্পর্শ করত না। আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই হীনতায় হেয়ার ক্লান্ত হননি, বরং শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে এই হীন বৈপরীত্যের অবসান কামনা করেছেন। বিনা বেতনে শিক্ষালাভে ইচ্ছুক দরিদ্র বালকগুলির ক্ষুধার্ত ও বিবর্ণ মুখ দেখে হেয়ার মায়ের মতো ব্যথিত হতেন এবং নিয়মিত ভাবে দেশীয় খাবারের দোকান থেকে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির বন্দোবস্ত করতেন। মায়ের মতো এই হৃদয় একমাত্র হিউম্যানিস্টেরাই অর্জন করতে পারেন।" হেয়ার সোসাইটিকে প্রচুর অর্থ দান করেন। ১৮২৮ সালে সোসাইটির ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশে তিনি এককালীন ছয় হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে তিনজন ব্যক্তি নব্যবঙ্গের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের দীক্ষাগুরু হিসেবে কাজ করেছেন।— ডিরোজিও ছাত্রদের মধ্যে ভাববিপ্লবের প্রবাহ সৃষ্টি করে পাশ্চাত্য-অনুরাগের সঞ্চার করেছেন ও যুক্তিবাদী মানসিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছেন; মেকলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সাহায্যে প্রাচ্য বিদ্যাকে সরিয়ে রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ডেভিড হেয়ার তাঁর ব্যাপক সামাজিক যোগাযোগ ও একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতীচ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার উপযোগী ছাত্রগোষ্ঠি সৃষ্টি করেছেন এবং সেই শিক্ষাকে সমাজের গভীরতম স্তরে পৌঁছে দেবার



রাজারামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

জন্য সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। একদিকে ভারতের রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধি রাধাকান্ত দেব এবং অন্যদিকে আধুনিক ভারতের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায় বাঙলাদেশের নবজাগরণের সূচনাকালে হেয়ার এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির সাথে অভিযোজন করে ইউরোপের শিক্ষার ইতিবাচক উপাদানগুলি সমাজের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করেছেন ও অনেকাংশেই সফল হয়েছেন। নিজের লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে একদিকে রাধাকান্ত দেবের সাথে স্কুল সোসাইটিতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। অন্যদিকে তিনি রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র সঙ্গে নব্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য

যোগাযোগ রেখেছেন, কিন্তু কখনও কোন ব্যক্তি স্বার্থকে প্রশ্রয় দেননি।

নিছক পুঁথিগত শিক্ষায় বা মুখস্ত বিদ্যায় পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না, এ'কথা হেয়ার বিশ্বাস করতেন। তাই হেয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে উচ্চশ্রেণির ছাত্রদের বিবিধ কাজকর্মের নৈতিক সমর্থক ছিলেন। এই কারণে তিনি ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ও 'ইয়ংবেঙ্গল' দের প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানোপার্জিকা' সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সব সভায় নৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয় সমূহের স্বাধীন ও সংকোচহীন আলোচনা এবং ফরাসী বিপ্লবের দর্শন ও টমাস পেইন-এর রাজনৈতিক চিন্তার অনুশীলন হতো। বলাই বাহুল্য ভারতবর্ষে এই আলোচনা ও অনুশীলনের ফল সুদূর প্রসারী হয়েছিল। "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নব্যবঙ্গের প্রথম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমাজসংস্কারক ও সমাজ-শিক্ষক হওয়ার শিক্ষণ কেন্দ্র ছিল।

... প্রতীচ্যের উন্নত মূল্যবোধ প্রচারে হেয়ার যে মঙ্গলযজ্ঞ শুরু করেছিলেন, হেয়ার-ডিরোজিও-র ছাত্রেরা সেই মঙ্গলযজ্ঞ অনির্বাণ রাখে— এখানেই প্রতীচ্যের জ্ঞানকে অধিকতর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার হেয়ার-এর প্রচেষ্টা সার্থক হয়।" হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে অথবা কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ (ডিরোজিও-র ছাত্র) স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয় থেকে



রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭)

বিতাড়িত হলেও ডেভিড হেয়ার কখনও তাঁদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। তিনি নিজের স্কুলে ডিরোজিওর বক্তৃতার আয়োজন করেছেন এবং ডিরোজিওর মৃত্যুর পর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনকে নিজের বাড়িতে আশ্রয়

দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মুক্ত বুদ্ধি ও মানবতাবাদী আলোচনা পরবর্তীকালে ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং বুর্জোয়া সভ্যতা বিকাশের পর্বে বুর্জোয়া হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদীরা জনকল্যাণের মানসিকতায় শিক্ষার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা মানবপ্রেম ও যুক্তি-মনস্কতাকে বড়ো করে দেখেছেন। উন্নত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য। ডেভিড হেয়ারের মধ্যে বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের এই আকাংক্ষিত গুণ প্রত্যক্ষ করা যায়।

কিন্তু বঙ্গীয় নবজাগরণের যে সীমাবদ্ধতা ছিল হেয়ার তাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। হেয়ার বিনা বেতনে পঠন পাঠনের ব্যবস্থায় সচেষ্ট হয়েছেন, ছাত্রদের অসুস্থতায় ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেছেন, অভাবে অর্থ যুগিয়েছেন নিঃস্বার্থভাবে। কিন্তু ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের মূল কারণের বিরুদ্ধে ছাত্র বা শিক্ষকদের উদ্যোগী হতে উপদেশ দেন নি। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রথম দিকে অন্যান্য পথিকৃতেরাও আমাদের দেশে ওই ধরণের উপদেশ দিতে সক্ষম হননি। এটাই আমাদের নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা। "দেশপ্রেম ও জাতীয়তা-এই দুইটি পরিণত রেণেসাঁসের লক্ষণ। বাঙ্লা নবজাগরণে, অন্তত নব-

জাগরণের প্রথমার্ধে, এই দুইটির বাস্তব রূপায়ণে নবযুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির অনীহা ছিল— কেন না তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশ শক্তির পতনের অর্থ অবক্ষয়যুক্ত সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা।" সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ে জর্জরিত থাকায় ইউরোপের কিছু উন্নত মূল্যবোধ লাভকে ভারতবাসী ইংরেজ শাসনের আশীর্বাদ বলে গণ্য করতো। উপনিবেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং মানবতাবাদী বহু আদর্শই বিকাশ হতে পারে না, এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি। বিশ্বাস করেছে যে শাসকের শুভবুদ্ধিতেই একদিন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসবে।

"১৮১৭ খ্রি.-এর ৪ জুন স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটি ছাত্রগণের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রিত করে এদেশে শিক্ষার এক নতুন দ্বার ও নতুন রীতি উন্মুক্ত করে নবযুগ আনয়ন করে। হেয়ার কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে প্রথম থেকে জড়িত ছিলেন এবং সোসাইটির প্রথম বৎসর থেকে নিজের মৃত্যুকাল পর্যন্ত সোসাইটিকে বার্ষিক একশত টাকা দান করেছিলেন। রামমোহন রায় রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ এই সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল।"

"...The calcutta School Book Society was founded by a number of European gentlemen for tho preparation, publication and cheap or gratuitous supply of useful school books, other than religious,

in English and Oriental languages. This society was established mainly with a view to the improvement of the system of instruction in the Native Indigenous schools (Private Pathsalas and Maktabs) in Calcutta and Bengal. The pupils in the pathsalas hardly read anything in those days, for there were no printed books to read from. Manuscripts were not easily available and were full of orthographical mistake."

রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বাঙালি শিক্ষিত কয়েকজন ব্যক্তিও স্কুল বুক সোসাইটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সোসাইটির পুস্তকাদি বিতরণ করার জন্য রাধাকান্ত দেব কলকাতাকে চারটি অংশে ভাগ করেছিলেন। প্রথম ভাগে ৩০টি পাঠশালার ৮৮০ জন ছাত্রের মধ্যে পুস্তক বিতরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল দুর্গাচরণ দত্তের উপর। দ্বিতীয় অংশের মধ্যে ছিল ৪৩টি পাঠশালার ৮৯৬ জন ছাত্র–এর দায়িত্বে ছিলেন রামচন্দ্র ঘোষ। উপানন্দ ঠাকুরের দায়িত্ব ছিল তৃতীয় অংশের ৩৬টি পাঠশালার ৫৭৪ জন ছাত্রের মধ্যে পুস্তক বিলি করা। রাধাকান্তদেব স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন চতুর্থ অংশের ৫৭টি পাঠশালার ১১৩১ জন ছাত্রের কাছে যাতে বই পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করা। সোসাইটির বইপত্র বিতরণের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির করা হত এবং ওই দিনে পুস্তক

সংগ্রহ করার জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হত। এইভাবে ৯৫টি পাঠশালার ২০০০ জন ছাত্রের কাছে সোসাইটির পুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। যদিও সেই সময় কলকাতায় পাঠশালার সংখ্যা ছিল ১৬৬টি এবং পাঠরত ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৩৮৪৭। এ ছাড়া কলকাতার পার্শ্ববর্তী গ্রামগঞ্জ থেকেও সোসাইটির পুস্তকাদির জন্য যথেষ্ট চাহিদা ছিল। কিন্তু কলকাতা থেকে দূরে অবস্থিত অঞ্চল থেকে সোসাইটির বই-এর চাহিদা প্রায় ছিল না বললেই চলে।

সোসাইটির কাজকর্মের উন্নতির জন্য ডেভিড হেয়ার যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন সেটা বিশেভোবে প্রণিধান যোগ্য। প্রতিবেদনটির অংশ বিশেষ নীচে উল্লেখ করা হল :

"The books that have been chiefly used by the school society, and with which I am best acquainted, are of the elementary kind, in Bengali and English; and I do not recollect any alterations of consequence in these books that I can propose."

"I would suggest the propriety of the society's republishing small editions of goldsmith's Abridgments of the Histories of England, Rome and greece, in English, and some small English reading books, contairing amusing tales and histories, such as more fit to read after the Spelling Book. Books

of this kind are much required in this country, and I am confident a considerable number would be of moderate price."

হেয়ার সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয়দের ইংরেজি এবং মাতৃভাষা, এই দুয়েরই পঠনপাঠন আবশ্যক। তাই সাবলীল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিত উন্নত মানের ইংরেজি ও মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক অধিক সংখ্যায় সরবরাহ করা হেয়ার একান্ত অপরিহার্য মনে করতেন।

১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ সালে হেয়ার ওই কলেজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। মেডিকেল কলেজের অবস্থা সংক্রান্ত ১৮৪১ সালের যে বিবরণী পাওয়া যায় তাতে ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"সরকার মি. হেয়ারকে কলেজ কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্য নিয়োগ করায় তাঁর কর্মোদ্যোগ এবং সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপ্রেরণা এই সময় অব্যাহতই ছিল এবং তার ফলে আমরা উপকৃত হয়েছিলাম। এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গো কাজ করেছিলেন। তার মৃত্যু এসে দেশীয় শিক্ষার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক ও উৎসাহী সমর্থকের জীবনদীপ নির্বাপিত করল।"

১৮৩৩ সালে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে গভর্নর জেনারেল বেন্টিং এই বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য

একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন ড. জন গ্রাণ্ট, ড. এম. জে ব্রামলে, জে.সি.সি. সাউদারল্যান্ড, সি.সি. ট্রেভেলিয়ান এবং রাম কমল সেন। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে লর্ড বেন্টিং ১৮৩৫ সালের ২০ জানুয়ারি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতার সব দেশিয় চিকিৎসা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করেন এবং সংস্কৃত কলেজে ও কলকাতা মাদ্রাসায় চিকিৎসাশাস্ত্র পঠনপাঠনের যে ব্যবস্থা ছিল তাও তুলে দেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপিয় বিজ্ঞান-ভিত্তিক চিকিৎসা শাস্ত্র পঠনপাঠনের জন্য একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশে বলা হয় যে ১৪ থেকে ২০ বছর বয়সের ইংরেজি ভাষা জানা ৫০ জন ছাত্র নিয়ে মেডিকেল কলেজটি খোলা হবে। ১৮৩৫ সালের ১ জুন হিন্দু কলেজের (বর্তমানের প্রেসিডেন্সী কলেজ) পেছন দিকে Petty Court jail এর জন্য রক্ষিত স্থানে নিম্নলিখিত চিকিৎসকদের নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ চালু করা হয় ঃ

ড. মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলে (সুপারিনটেনডেন্ট, কিছুদিন পরেই তাঁকে অধ্যক্ষ পদে উন্নীত করা হয়;

ড. ডবলিউ.বি. ও'স্যাংনেসী এবং ড. এইচ.এইচ গুডিভ (অধ্যাপক)

সংস্কৃত কলেজের জনৈক চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষক মধুসূদন গুপ্ত (অ্যানাটমি ও শল্য চিকিৎসা বিভাগের ডেমন্‌স্ট্রেটর, পরে আসিস্‌ট্যান্ট প্রফেসর)।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবাদীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। তাঁরা মনে করলেন যে এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় বিশ্বাস ও জ্ঞানবিজ্ঞানকে অবনমন করা হচ্ছে। শবব্যবচ্ছেদের অ্যানাটমি শিখনের বিরুদ্ধেও তাঁরা সরব হলেন। এই পরিস্থিতিতে মেডিকেল কলেজের জন্য ছাত্র পাওয়া সম্পর্কে প্রচণ্ড সংশয় দেখা দিয়েছিল। এই সংশয় ও সংকটের সময় ডেভিড হেয়ার সফল পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর সক্রিয় সাহায্য ছাড়া আধুনিক চিকিৎসা সংক্রান্ত পড়াশুনার সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব ছিল। হেয়ারের অনুপ্রেরণায় স্কুল সোসাইটির স্কুল বিশেষত পটলডাঙ্গা স্কুলের কৃতি বহু ছাত্র মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হতে শুরু করে। ওই স্কুলের জনৈক শিক্ষক দুর্গাচরণ মিত্রও মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। উনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। প্রসঙ্গত ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে অধ্যক্ষ ড. ব্রামলের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে :

"His advice and assistance have been to me, at all times, most valuable; his frequent attendance at the lectures and at the Institution generally, have materially ended to promote the spirit of good feeling and friendly union among the pupils. Nor must I omit to mention that his patience and discretion have animated and supported me under circumstances of piculiar difficulty which at one

time appeared to threater the very existence of the Institution."

তিনি আরো বলেছিলেন— "In truth, I may say that without Mr. Hare's influence any attempt to form a Hindu Medical class would have been futile."

১৮৩৭ সালে ১৯ জানুয়ারি ড. ব্রামলের মৃত্যুর পর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের পদটি তুলে দেওয়া হল এবং ডেভিড হেয়ারকে কলেজের সেক্রেটারি ও ট্রেজারের পদে নিয়োগ করা হয়। ১৮৩৭ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। ১৮৪১ সালে তিনি মাসিক মাহিনাযুক্ত এই পদটি ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে সরকার তাঁকে কলেজের কাউন্‌সিলের অবৈতনিক সদস্য হিসেবে মনোনীত করেছিলেন।

ভারতীয় শিক্ষার একটিমাত্র ক্ষেত্র যেখানে ডেভিড হেয়ার প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন— সেটি স্ত্রী শিক্ষা। কারণ তিনি মনে করতেন যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সমাজে তখনও সৃষ্টি হয়নি। কথিত আছে, তিনি একবার বলেছিলেন যে যদি তিনি আরও দশ বছর বেঁচে থাকেন তবে বাংলার স্ত্রী শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন। তবে মেয়েদের শিক্ষার জন্য তাঁর সহানুভূতির কোন ঘাটতি ছিল না। তিনি ১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠি 'Ladies Society for Native



মেডিকেল কলেজের 'ডেভিড হেয়ার ব্লক'
—পূর্বের নাম প্রিন্স অব ওয়েলস্ হস্‌পিটাল

Female Education' কে নিয়মিত আর্থিক অনুদান দিতেন এবং রাধাকান্ত দেবের গৃহে যখন হিন্দু মেয়েদের পরীক্ষা হত তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতেন।

হেয়ার স্কুল

ডেভিড হেয়ারের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর নামাংকিত হেয়ার স্কুল সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ এই স্কুলটি ছিল তাঁর বড়ো আদরের। বলা যেতে পারে এটিকে কেন্দ্র করেই তাঁর বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ। হেয়ার স্কুল সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন সময়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছিল। শুরুতে এটিকে স্কুল সোসাইটির স্কুল বলা হত। কারণ এটি সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হত। পরবর্তীকালে স্কুলটি 'Preparatory School' হিসেবে পরিচিতি লাভ করল। কারণ হিন্দু কলেজে ভরতির জন্য প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রদের প্রস্তুত করত। স্কুলটিকে অনেকেই পটলডাঙ্গা স্কুল বলত কারণ সেই সময়ের পটলডাঙ্গা থানার কাছে এটি অবস্থিত ছিল। চাঁপাতলা নামের একটি

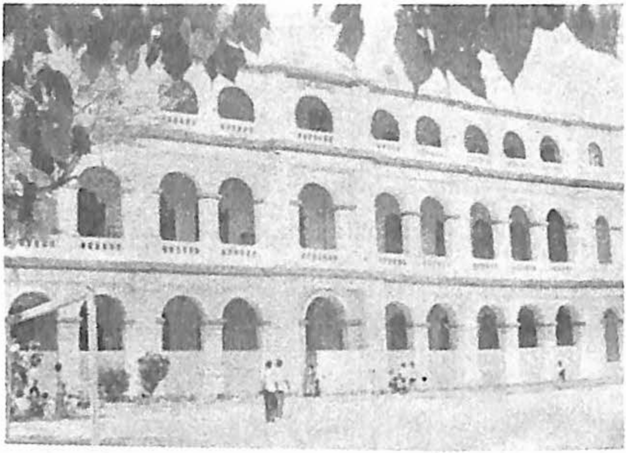


প্যারীচাঁদ মিত্র

স্থান বিদ্যালয়টির কিছুটা দক্ষিণে ছিল। তাই হয়তো বাবু কিশোরী চাঁদ মিত্র বিদ্যালয়টিকে চাঁপাডাঙ্গা স্কুল বলতেন। ডেভিড হেয়ার স্কুলটিকে 'The School Society's English School at College Square'—এই নামে অভিহিত

করতেন। হেয়ারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতি এটির দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এটির নাম হয় 'Hindu College Branch School' অথবা সংক্ষেপে 'Branch School'। সেই সময়ে 'Branch School' এবং 'Collegiate School' কথা দু'টি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হত। বর্তমানের হেয়ার স্কুল ছিল হিন্দু কলেজের 'Branch School' এবং হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগকে বলা হত 'Collegiate School'। হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক মি. রিচার্ড জোন্‌স্‌ 'Branch School' টির পরিদর্শক হিসেবে বাড়তি মাসিক পঞ্চাশ টাকা পেতেন। ১৮৫৪ সালে স্কুলটি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের এবং ওই বছরের কিছু সময় পরে হিন্দু কলেজের নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ হিসেবে পরিবর্তনের পর বিদ্যালয়টি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রানাধীন হয় এবং-এর নাম হয় 'Colootola Branch School'। বিদ্যালয়টি ১৮৪৩ সালে পটলডাঙ্গা থেকে হিন্দু কলেজের পশ্চাদ্ভাগে কলেজের একটি জমিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭১ সালের ১ জানুয়ারি হেয়ার স্কুল তার বর্তমানের নিজস্ব বাড়িতে উঠে আসে। ১৮৬৭ সালে বিদ্যালয়ের তদানিন্তন প্রধান শিক্ষক বাবু প্যারীচরণ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ'টির নামকরণ করা হয় 'Hare School' হিসেবে।

স্কুল সোসাইটির তিনটি স্কুলকে দশটি করে মোট ৩০টি ছাত্র হিন্দু কলেজে পাঠাবার অধিকার দেওয়া



১৮৭১ সালে নির্মিত 'হেয়ার স্কুল'-এর বাড়ি

হয়েছিল। কিন্তু সোসাইটির অধিকাংশ অর্থ যে ম্যাকিন্‌টশ্‌ অ্যান্ড কোম্পানিতে গচ্ছিত ছিল, ১৮৩২-৩৩ এ সেটি ফেল পড়ে। ফলে স্কুলগুলিকে সোসাইটি থেকে কোন অর্থ সাহায্য করা আর সম্ভব ছিল না। এই সময়ে হেয়ার-এর তত্ত্বাবধানে এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁরই অর্থানুকূল্যে একমাত্র পটলডাঙগা ইংলিশ স্কুলটির (বর্তমানের হেয়ার স্কুল) অস্তিত্ব ছিল। ফলে হিন্দু কলেজে ত্রিশটি ছাত্রই ওই স্কুল থেকে পাঠানো হতে থাকে। ওই স্কুল থেকে আসা ছাত্ররাই ছিল হিন্দু কলেজের রত্ন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্যারীচরণ সরকার, মহেন্দ্রলাল সরকার, হরগোবিন্দ সেন, ব্রহ্মমোহন মল্লিক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখের নাম। ঊনবিংশ

শতাব্দীর উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন এঁরা। এ'প্রসঙ্গো কিশোরী চাঁদ মিত্রের উক্তি— হিন্দু কলেজের ওইসব ছেলেরা ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মতো। ভোরের প্রথম আলো প্রতিফলিত হয়েছিল তারই শীর্ষে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে সে আলো নেমে এসেছিল সমতলে।

ডেভিড হেয়ার স্কুল সোসাইটির প্রতিটি স্কুলের ও হিন্দু কলেজের পরিদর্শক হিসেবে প্রত্যেক দিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেখানেও তিনি নিয়মিত কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। কোর্ট অব রিকোয়েস্টস-এ চাকরি পাবার পরেও তিনি এই ব্যাপক পরিদর্শনের কাজ নিষ্ঠার সাথে করেছেন।— বেলা ৩টা থেকে ৬টা/৭টা পর্যন্ত তখন পরিদর্শনের কাজ করতেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ডিরোজিও-র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নিয়মিত পরিদর্শন। ডিরোজিও-র শিষ্যরা কলকাতার বিভিন্ন স্থানে গরিব ছেলেদের বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জন্য অনেকগুলি স্কুল পরিচালনা করতেন। সেখানেও হেয়ার ছিলেন পরিদর্শক।

ছাত্রদের প্রতি হেয়ারের ছিল অসীম মমতা। যে কোনো বালক তাঁর কাছে এলেই প্রথমেই প্রশ্ন করতেন, সে ক্ষুধার্ত কিনা। হয়তো পিতৃস্নেহে ছেলেটির মুখ দেখেই বুঝতে পারতেন সে অভুক্ত। তাই নির্দেশ দিতেন, এই স্লিপ

নিয়ে সামনের দোকানে যাও এবং যা ইচ্ছে খেয়ে এসো। স্কুলের শেষে দরজায় জলভরতি বালতি ও তোয়ালে নিয়ে হেয়ার দাঁড়িয়ে থাকতেন— ছেলেদের ধুলিমলিন অঙ্গ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিতেন। কোন ছাত্র পরপর কয়েকদিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকলে তার বাড়ি গিয়ে স্কুলে না আসার কারণ অনুসন্ধান করতেন। সঙ্গে থাকতো ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় পথ্যের ব্যবস্থা। প্রয়োজনে ছাত্রদের বাড়ি পৌঁছেও দিতেন। ছেলেদের সঙ্গে সমান-বয়সী বন্ধুর মতো বল খেলতেন এবং কখনও বা নিজে ঘোড়া হয়ে তাদের পিঠে চড়াতেন।

অসম-সাহসী ছিলেন হেয়ার। মাতাল গোরা-পল্টনী-জাহাজীদের মস্তানগিরি প্রতিরোধ করার প্রয়োজনে একটা মোটা লম্বা লাঠি হাতে রাত-বিরোতে পথ চলতেন তিনি। পথে একটি ছোটো ছেলের হাত থেকে বালা ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে কোন চোর। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু ধাওয়া করেছেন হেয়ার। গাড়ি করে হিন্দু কলেজে পড়তে এসেছে কোন ছেলে। এক যণ্ডামার্কা মাতাল সাহেব-জাহাজি কোচমানের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে গাড়ি ভেঙে দিয়েছে। কোচমান ভয়ে পালিয়েছে এবং কলেজের দারোয়ানও তাই। হেয়ার জানতে পেরে গুণ্ডার পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে পুলিশের হাতে জমা করেছেন।

প্রত্যেক দিন কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের গঙ্গার ধারে অবস্থিত একটা বাড়ি থেকে হেয়ারের পালকি দুলি চলত লালদিঘির ধার দিয়ে ডোমতলাকে পাশ কাটিয়ে

কলুটোলার পথ ধরে পটলডাঙা, আরপুলি, বেনেটোলার দিকে। হেয়ার স্কুল পরিদর্শন করতে যেতেন। সঙ্গে থাকত অনেকগুলি বই আর কিছু ওষুধ-পত্র। আর দেখা যেত ওই পাল্‌কির সাথে নানা বয়েসের কিছু ছেলে ছুটছে, শুধু ছুটছেই না হেয়ার সাহেবকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছেও।— কান পাতলে শোনা যেত তারা বলছে, 'me poor boy... have pity on me'...'me take in your school'। সকালে হেয়ারের বাড়ি থেকে পাল্‌কি বেরুবার পর সারাদিন যেখানেই তাঁর পালকি যেত, সেখানেই দেখা যেত প্রতিদিন এই দৃশ্য। ছেলেরা ওই ভাবে ছুটবে নাই বা কেন? হেয়ারের স্কুলে ভরতি হওয়া কি সোজা ব্যাপার। নতুন যুগের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও একাগ্রতা প্রমাণ করে তারা হেয়ারের স্কুলে ভরতি হয়েছে।

পথ চলতে চলতে রাস্তার দু'ধারের মানুষগুলিকে দেখে হেয়ার ভাবতেন যে এত উন্নত ও ঐতিহ্যবাহী জাতির কী দুরবস্থা, এর থেকে মুক্তির উপায় শিক্ষা। তিনি যেখানেই যেতেন দেশিয় বড়োলোক বা পণ্ডিত দেখলেই বলতেন দেশের ছেলেদের লেখাপড়ার কথা। তাঁর স্বপ্ন ছিল, মানব সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বিদ্যা, আধুনিক শিক্ষা এদেশের আগামী নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। এ' ব্যাপারে হেয়ারের একটা বাড়তি সুবিধা ছিল— ওই সময়ে নতুন ঘড়ি তৈরি করতে এবং বিকল ঘড়ি মেরামত করতে হেয়ারের সমকক্ষ কেউ ছিল না বলা

যায়। তাছাড়া তাঁর মিষ্টি ব্যবহার, অমায়িক স্বভাব খদ্দেরদের খুব সহজেই আকৃষ্ট করত। কাজের দক্ষতা এবং স্বভাবের মাধুর্যে অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার ছোটো-বড়ো অনেকের কাছেই সজ্জন হিসেবে হেয়ারের বেশ নাম হয়েছিল। ঘনিষ্ঠ হবার পর হেয়ার অনেককেই বলতেন, আপনারা এমন ভাবে কেন সময় কাটান, কেন লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আপনাদের আগ্রহ এত কম, আপনাদের দেশ কত সুন্দর, কত উন্নত ছিল আপনাদের অতীত, বর্তমানে আপনাদের এমন খারাপ অবস্থা কেন?

কলকাতার মানুষজনদের হেয়ার এই ধরণের কথা বলতেন কারণ তিনি প্রত্যক্ষ করতেন, প্রায় প্রতিদিন কলকাতার বাবুদের বাড়িতে কোথাও বাইজিদের নাচ হয়, কোথাও বা যাত্রা। কারোও বাড়ি কবিগান হয়, কেউ বা আখড়াই অথবা খেমটা নাচের আসর বসায়। রবিবার বা ছুটির দিন কারো বাড়িতে শুরু হয়ে যায় বুলবুলির লড়াই। কোথাও চলতো সুতোয় টাকা বেঁধে ঘুড়ি ওড়ানো। কোথাও বা লাখ টাকা খরচ করে বেড়াল বা বাঁদরের বিয়ে দেওয়া হত। তখনকার কলকাতার কত ধরণের মজা লোটার আসর বসত। কোথাও বাজি ধরে সন্দেশ খাওয়ার জন্য সন্দেশের মজলিশ বসত। কোথাও বা মানুষ পাখির সভা বসত— অর্থাৎ বড়ো বড়ো খাঁচার ভেতর মানুষ-পাখিরা থাকত, খাঁচা শুদ্ধ তাদের সভায় নিয়ে আসা হলে কেউ কাক, কেউ কাদাখোচা, কেউ সারস, কেউ বা বক-এই রকম নানা ধরণের পাখির মতো

আওয়াজ করে কথা বলত। তিনি আরও দেখেছেন যে এদেশীয়রা যে ইংরেজি শেখে তাতে ইয়েস-নো-ভেরিগুড গোছের ইংরেজি বলা চলতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা উন্নতমানের ভাষা-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জ্ঞান আয়ত্ত করা আদৌ সম্ভব নয়।

হেয়ার দেখলেন, "বাঙালিদের মধ্যে বাংলা কি ইংরেজি কিছুই উত্তমরূপে অনুশীলন হইতেছে না— ছাত্ররা কেবল কিঞ্চিৎ অঙ্কবিদ্যা, পত্রলেখা, জমা ওয়াসিল বাকি, গুরুদক্ষিণা ও গঙ্গার বন্দনা শিখিতেছে, কিন্তু শুদ্ধ লেখনে ও কথা কহিতে অক্ষম। ইংরেজিও সামান্য রূপে শিক্ষা হইতেছে। ভালো পুস্তক নাই, ভালো শিক্ষক নাই।" শহরের বাবুদের অনুকরণে অতি অল্প বয়সেই ছেলেরা চরস-গাঁজা প্রভৃতি খাইতে শিখিত এবং অনেক সময়ে তার থেকেও গুরুতর পাপকাজে লিপ্ত হত। এদের দেখে ডেভিড হেয়ারের আতঙ্ক হত। যখন আরপুলি, কলুটোলা, পটলডাঙায় স্কুল তৈরি হয়ে গেছে তখনও তিনি ছাত্রদের সম্পর্কে এবিষয়ে সংকিত ছিলেন এবং এই বিষাক্ত সংসর্গ থেকে স্কুলের ছেলেদের বাঁচাবার জন্য সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি দিতেন।

১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়— অর্থাৎ ডেভিড হেয়ার যে বছর কলকাতায় পৌঁছেছেন সেই বছর, এই কলেজের ছাত্র হত ইংরেজ প্রশাসকেরা, যাঁরা সদ্য বিলেত থেকে আসত এই দেশের শাসন কাজ পরিচালনার জন্য। এদেশের পণ্ডিত ও

মৌলভিদের কাছে তারা সংস্কৃত-আরবি-ফারসি এবং কিছু কিছু বাংলা শিখত। আর সেই সঙ্গে শিখত এদেশের আচার-ব্যবহার আদব-কায়দা। এ'সব শেখাবার জন্য দেশিয় ভাষায় লেখা কিছু বইপত্তরও এখান থেকে প্রকাশিত হত। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষাদীক্ষা ওই কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। বাইরের সাধারণ লোকজন এর দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হতে পারত না। কিন্তু সমাজের ভেতরে নানাভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। ১৭৯৪ সালে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হল। সাহেবরাই এর বিচারপতি, কেউ কেউ উকিল-মোক্তার। এখানে কাজকর্মের জন্য দেশিয় লোকজনের প্রয়োজন হবেই। তারা সাহেব-মোক্তারদের কেরাণি বা অন্য ধরণের কর্মচারি হতে পারলে ভালোই রোজগার করার সুযোগ পেতে পারত। কিন্তু তার জন্য তো একটু-আধটু ইংরেজি শিখতে হয়। তাই দেশিয় অনেকের মধ্যে ইংরেজি শেখার উৎসাহ সৃষ্টি হল। তবে এই ইংরেজি শেখার বা শেখানোর ক্ষেত্রে ব্যাকরণ বা রচনাশৈলীর কেউ ধার ধারত না। শুধু ইংরেজি শব্দ শিখলেই ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারত। যে যত বেশি ইংরেজি শব্দ শিখত সে তত বড়ো পণ্ডিত হিসেবে গণ্য হতে পারত। এই অবস্থায় ডেভিড ড্রামণ্ড, সেরবাণ প্রভৃতি সাহেবরা যেমন তাঁদের বাড়িতেই ইংরেজি শেখাবার ব্যবস্থা করল, সেইসঙ্গে এদেশিয় অনেকেই ইংরেজি শেখাবার পাঠশালা

খুলেছিল— যেমন 'রামমোহন নাপিতের স্কুল', 'কৃষ্ণমোহন বসুর স্কুল', 'শিবু দত্তের স্কুল' ইত্যাদি। এই সব স্কুল থেকে কে কয়টি ইংরেজি শব্দ শিখেছে সেই মর্মে সার্টিফিকেট দেওয়া হত। সাহেবদের স্কুলে ইংরেজি শেখার জন্য খরচ খুব বেশি ছিল— মাসে আনুমানিক পাঁচ থেকে পনেরো টাকা। তাই সাধারণ লোকজন্য এদেশিয়দের ইংরেজি পাঠশালাতেই ইংরেজি শেখার জন্য ভিড় করত। এই সব ব্যাকরণহীন বাক্যরচনা ইংরেজি শব্দ শিখিয়েরা ইংরেজিতে যেভাবে কথাবার্তা বলতো তা'নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প প্রচলিত আছে। রাজনারায়ণ বসুর 'সে কাল আর এর কাল' 'গ্রন্থে এই সব মজার গল্পের কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ-এর ভাষাতেই সেই উদাহরণের নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে :

"...একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল— মাষ্টর ক্যান লিব্, মাষ্টর ক্যান ডাই। (Master can live, Master can die?" অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব "What, master can die ?" এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উঠাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, 'ডাই' শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন 'স্টাপ দেয়ার (stop there) অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইও না, এই বলিয়া হাত উঁচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, 'ডাই মি' (Die me) অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন।

'ইফ্ মাস্টর ডাই, দেন আই ডাই', মাই কো ডাই, মাই ব্লাক স্টোন ডাই, মাই ফোরটীন জেনারেষণ ডাই।'— 'If master die then I die, my cow die, my black-stone die, my fourteen generation die।' — 'যদ্যপি মণিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গোরু মরিবে, আমার ব্লাক-স্টোন অর্থাৎ বাড়ির শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ফোরটিন জেনারেষণ অর্থাৎ চোদ্দ পুরুষ মরিবে।"....

একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন সে আইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল কেন আইস নাই।' সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বলিয়া উঠিল 'চর্চ্চ' (church)। রথের আকার গির্জার মতো, তাই কথাটি বুঝাইবার পক্ষে বড়ো উপায় হইল। কিন্তু চর্চ্চ বলিলে ইটের গাঁথুনি বুঝায়, এই জন্য পরক্ষণেই বলা হইল, 'উডেন চর্চ্চ' অর্থাৎ কাষ্ঠের গির্জ্জা। তাহা হইলেও বুঝা গেল না। তখন তাহাকে আরো ব্যাখ্যা করিতে হইল— 'থ্রিস্টারিস্ হাই।' (Three stories high), 'গাড আলমাইঠী-সিট্ আপন' (god Almighty sit upon) অর্থাৎ জগন্নাথ দেব বসিয়া আছেন, 'লাং লাং রোল' (Long Long rope) 'থৌজন্ড মেন ক্যাচ' (Thousand men catch), 'পূল পূল পূল' (Pull, Pull, Pull), 'রনাওয়ে রনাওয়ে' (Run away, run away), 'হরি হরি বোল— হরি হরি বোল।"

বাঙালীদের ওই সময়ের ইংরেজিতে কথাবলা প্রসঙ্গো আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি :

কোন একজন ইংরেজের বাঙালি কেরাণি রোজ দুপুরে সাহেবের ঘোড়ার দানা চুরি করে টিফিন করতো। তার দেখাদেখি সহিসরাও ঘোড়ার দানা বিক্রি করে দিত। সাহেব একদিন সহিসদের দানা চুরি ধরে ফেলল। তখন সহিসরা কেরাণীবাবুও যে প্রতিদিন ঘোড়ার দানা চুরি করে টিফিন করে সেটা বলে দিল। সাহেব যখন ওই বাবুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল, বাবু আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললে, "Yes sir, My house morning and evening twenty leaves fall, little little pay, how manage?" অর্থাৎ বাবুটি বলতে চাইলো তার বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যে কুড়িটি পাতা পড়ে, অল্প মাইনে, তাই কেমন করে সংসার চালাবেন।

কলকাতা সমাজের এই রকম অবস্থায় দুটি ইতিবাচক ঘটনা ঘটল। — ১৮১৩ সালে শিক্ষানুরাগী স্যার হাইড ইস্ট (Sir Hyde East) সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়ে কলকাতায় এলেন। ১৮১৪ সালে রামমোহন রায় স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য কলকাতায় এলেন। বঙ্গদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রসারে ও সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে এ'দুটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাইড ইস্ট বিচারালয়ের বাইরে এদেশের একজন হিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি তাঁর সদিচ্ছা ও আচার আচরণের মাধ্যমে কলকাতার প্রতিষ্ঠাবান ও শিক্ষিত জনসমাজের কাছে পরিচিত

হয়েছিলেন। এর ফলে তিনি কলকাতা আসার দু'বছরের মধ্যেই তাঁর কাছে এদেশের কেউ কেউ শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ কামনা করে প্রস্তাব পাঠাতে শুরু করেন। উল্লেখ্য যে ঘড়ির ব্যবসা এবং অন্যান্য সূত্রে ইস্টের সাথে হেয়ারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

অন্যদিকে রামমোহনও কলকাতায় এসে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির গুণে এদেশের খ্যাতিমান ইংরেজদের এবং গণমাণ্য বাঙলিদের সাথে অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। ডেভিড হেয়ারও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজন হয়ে উঠলেন। রামমোহনের সারকুলার রোডের বাসভবনে যে সব মজলিশ-আলোচনা-খানাপিনার আসর বসত সেখানে দেশি-বিদেশি গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে হেয়ারকেও দেখা যেত।

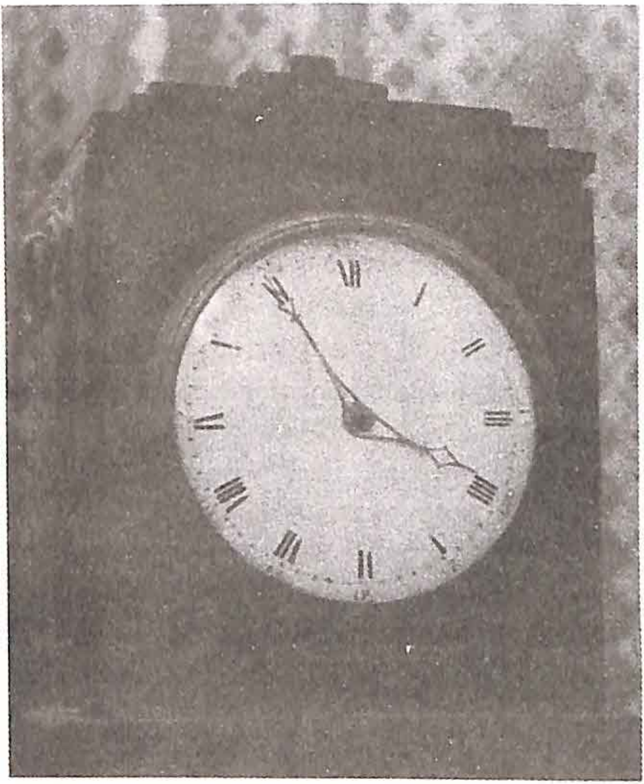
এই দুই ব্যক্তির সাথে হেয়ারের ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁদের সহযোগিতা তাঁকে বাঙলার শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

ডেভিড হেয়ার ও হিন্দু কলেজ

১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু কলেজ আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান। হিন্দু কলেজের আদি-কল্পক কে?-এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে পণ্ডিতজনের মধ্যে মতান্তর ঘটেছে-এবং সেই বিতর্ক উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। ডিরোজিও ডেভিড হেয়ারকে হিন্দু কলেজের আদি-কল্পক হিসেবে গণ্য করেছেন। ১৮৩২ সালের জুন মাসে মিশনারীদের মুখপত্র 'calcutta christian observer'-এ ডিরোজিও-র মতটি উল্লেখিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং যোগেশচন্দ্র বাগলও ডিরোজিও-র মতকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের অন্যতম ডাইরেকটার রাধাকাণ্ড দেব উল্লেখ করেছেন যে সুপ্রীম কোর্টের তদানিন্তন বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট-ই হিন্দু কলেজের আদি-কল্পক।

ঐতিহাসিক ড. রমেশ মজুমদার রাধাকান্ত দেবের মতকে সমর্থণ করেছেন। ১৮৩০ সালে হিন্দু কলেজের হিন্দু প্রধানগণ স্যার ইস্ট ও ডক্টর উইলসন-এর স্মৃতি রক্ষা করার জন্য উদ্যোগী হন এবং স্যার ইস্ট-এর একটি মূর্ত্তি নির্মাণ করা হয়। যেখানে ইস্টকেই হিন্দু কলেজের আদি-কল্পক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু স্মৃতিরক্ষার ওই প্রচেষ্টায় হেয়ারকে বাদ দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে হিন্দু কলেজ ও স্কুল সোসাইটির ছাত্রেরা হেয়ারের একটি প্রতিকৃতি অংকনের এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একটি মানপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ডিরোজিও ছাত্রদের এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করে একটি সনেট রচনা করেছিলেন।

হিন্দু কলেজের আদি-কল্পক কে সে ব্যাপারে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু একথা নিঃসংকোচে স্বীকার করতে হয় যে কলেজটির গঠনপর্বে হেয়ার-এর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে সাধারণ সভা হয়েছিল এবং যে সাব কমিটি গঠিত হয়, তাতে হেয়ার-এর নাম না থাকলেও, কলেজ প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই হেয়ারকে কলেজের পরিদর্শক হবার জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুরোধ করা হয় এবং তথ্যাদি প্রমাণ করে যে ১৮২৫ সালের মাঝামাঝি থেকে কলেজ কমিটির সভায় হেয়ার হিন্দু কলেজের অন্যতম ডাইরেকটর হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। ১৮৩৬ সালে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন-এর সেক্রেটারী সাদার্লন্ড কমিটিকে



হেয়ার স্কুলে রক্ষিত ডেভিড হেয়ার কর্তৃক প্রস্তুত একটি ঘড়ি

একটি রিপোর্টে মন্তব্য করেন, "I cannot conclude this without again noticing the invaluable service which Mr. Hare, my co-visitor, continues to render to the Hindoo college and the cause of education generally." জেনারেল কমিটিও, হিন্দু কলেজ, কলকাতা স্কুল সোসাইটি এবং সাধারণভাবে আমাদের দেশের শিক্ষার

প্রসার ও উন্নয়নে হেয়ারের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নিমাই সাধন বসুর অভিমত যে "...the idea of the Hindu college originated with David Hare but its implementaion was possible owing to the interest and initiative of Sir Hyde East." তিনি আরও উল্লেখ করেন, "According to Pearychand Mitra, biographer of David Hare, the idea of an institution imparting English education originated with David Hare when he attended 'uninvited' a meeting called by Rammohun and his friends for the purpose of establishing a society calculated to subvert idolatry. Hare suggested that the establishment of an English school would materially serve that purpose. Every one present 'acquiesced' in the strength of Hare's position, but did not carry out his suggestion. Hare then approached Sir Hyde East through Baidyanath Mukherjee who used to visit high officials. Hyde East viewed the suggestion with sympathy and he sounded other leading members of the Hindu society and found them agreeable to his proposal. Several meetings were held at Hyde East's residence and it was resolved that an establishment be formed for the education of native youth'. But the orthodox Hindus refused to have any connection with the school if Rammohun was included in its

managing committee. This put Hyde East in a difficulty and it seemed that the plan was in jeopardy. But when Hare informed Rammohun of the development, the latter at once decided to stay away from the proposed school, as he valued the education of his countrymen more than the empty flourish of his name as a committee man. This story is corroborated by Rajnarayan Bose's account of the origin of the Hindu college."

উপরিউক্ত মন্তব্যটিকে অনুসরণ করে কীভাবে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন হয়েছিল সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। সপ্তাহে দুদিন করে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশন বসত— রামমোহনের বাড়িতে, কখন বৃন্দাবন মিত্রের বাড়িতে, কখন রাজা কালীশংকর ঘোষালের বাড়িতে এবং কখনও বা তুলা বাজারে বিহারীলাল চৌবের বাড়িতে। ১৮১৬ সালে এই রকম কোন এক সভায় হেয়ার বিনা নিমন্ত্রনেই উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায় ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন দেশে পৌত্তলিকতা উচ্ছেদের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে 'বেদান্ত বিদ্যালয়' স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আলোচনার শেষে হেয়ার সবিনয়ে বললেন যে রামমোহনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা যেখানে নতুন প্রজন্মের ছেলেরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে

আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসতে পারে। 'বেদান্ত বিদ্যালয়' এই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে না। রামমোহন নিজে এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলে হেয়ারের এই মত সমর্থন করলেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন বিখ্যাত বিচারপতি অনুকুল মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুরদা এবং এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সেকালে চলমান গেজেট হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তখনকার দিনে কলকাতার বড়ো বড়ো ইংরেজি কর্মচারি এবং হিন্দু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁদের বাড়িতেও তিনি প্রায়শ যাতায়াত করতেন এবং দেশের নানাবিধ খবরাখবর সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তিনি উক্ত আলোচনার বিষয় এবং হেয়ারের মতামত বিচারপতি হাইড ইস্টের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হলেন। ইস্টের মতো একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি যদি বিষয়টি সম্পর্কে উৎসাহী হন তাহলে রাজকর্তৃপক্ষ ও দেশির গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করতে পারবেন না, এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে সভার সকলেই বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করলেন। বিচারপতি হাউড ইস্ট বৈদ্যনাথ বাবুর মারফৎ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি শুনে খুব উৎসাহী হলেন এবং এ'ব্যাপারে হিন্দু সমাজপতিদের মতামত সংগ্রহ করার জন্য বৈদ্যনাথবাবুকে অনুরোধ করলেন। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও মহা উৎসাহে বিষয়টি সম্পর্কে জয়কৃষ্ণ

সিংহ, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার, জয়গোপাল তর্কালংকার প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করলেন। সকলেই এই প্রস্তাবটির প্রতি সহমত জ্ঞাপন করলেন এবং এ'ব্যাপারে সব রকম সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

হাউড ইস্ট সকলের মতকে আনুষ্ঠানিকভাবে একত্র করবার জন্য ১৮১৬ সালের ১৪ মে তাঁর বাড়িতেই একটি সভার আয়োজন করলেন এবং একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তাঁর খসড়া পরিকল্পনা পেশ করলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং এ'ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দেবারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। হেয়ার ও রামমোহন প্রকাশ্যে না এসেও সমস্ত ব্যাপারটি সম্পর্কে খুটিনাটি সব সংবাদ সংগ্রহ করতেন। প্রকাশ্যে না আসার কারণ ছিল যে রামমোহন তাঁর হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, পৌত্তলিকতা এবং সতীদাহ বিরোধী মতামত ও কার্যকলাপের জন্য তদানিন্তন সমাজ পতিদের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন এবং তাঁরা রামমোহনকে 'নাস্তিক', 'পাষণ্ড' ইত্যাদি বলে গালাগাল দিতেন। ডেভিড হেয়ারও ধর্ম সম্পর্কে আদৌ উৎসাহী ছিলেন না।

অনেকখানি এগিয়েও প্রস্তাবিত ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি প্রচণ্ড বাধা উপস্থিত হল— দেশের গণ্যমান্য সমাজপতিরা বৈদ্যনাথবাবুকে বললেন যে তাঁরা জেনেছেন যে নাস্তিক রামমোহন প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের



দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)

সাথে যুক্ত হবেন। সুতরাং যে কাজে রামমোহন আছে তার সাথে তাঁরা কোনোভাবেই যুক্ত থাকবেন না। একথা ঠিক যে রামমোহন পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়-এর সাথে যুক্ত। বৈদ্যনাথবাবু ইস্টের কাছে বিষয়টি জানাতে তিনি অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে পড়লেন। কীভাবে এই বাধা অতিক্রম করা যায়? চিন্তিত হলেন হেয়ারও— তাঁর স্বপ্ন বুঝি আর রূপায়িত হল না। একদিকে ধর্মান্ধ সমাজপতিদের প্রতিবাদ এবং অন্যদিকে রামমোহনের মতো প্রাজ্ঞ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত। কীভাবে অগ্রসর হবেন? তাছাড়া এ'কথা রামমোহনকে বলাই বা কীভাবে যাবে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যিনি তাঁর সবচেয়ে বড়ো সহায় এবং এ'ব্যাপারে যাঁর এত উৎসাহ? একদিন অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষ মুখে হেয়ার রামমোহনের বাড়ি গেলেন। রামমোহন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বাসের সাথে বন্ধু হেয়ারকে আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু হেয়ারকে নিশ্চুপ দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বাধ্য হয়ে অত্যন্ত হতাশভাবে সমাজপতিদের সেই লজ্জাস্কর ও অসম্মানকর জেদের কথা হেয়ার বন্ধুকে বললেন। সব শুনে রামমোহন যা করলেন তাতে আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। হেয়ারকে রামমোহন নির্দ্বিধায় বললেন, এদেশের ভালো করবার জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করেছেন। তাই তিনি সরে থাকলে যদি এদেশে আধুনিক শিক্ষার জন্য একটি স্কুল গড়া যায় তবে তিনি আনন্দের

সাথেই সেই পথ অনুসরণ করবেন। — হিন্দু কলেজ স্থাপনের শুরুতেই রামমোহনকে কেন্দ্র করে গোঁড়া হিন্দু সমাজপতিদের মধ্যে যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কেটে গেল।— আধুনিক ভারত গড়ার পথিকৃৎ রামমোহন রায়ের উদারতার কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হল। ইংরেজি শিক্ষা এবং তার জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে রামমোহনের অদম্য উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও তিনি ওই উদ্দেশ্য সিদ্ধির তাগিদেই হিন্দু কলেজ থেকে দূরে সরে থাকলেন। এ'ছাড়া হিন্দু কলেজ স্থাপনের মতো বিরোধ কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে রামমোহনের নিস্পৃহ থাকার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

অন্যদিকে, কি এদেশিয় অথবা বিদেশী তখনকার দিনে কলকাতায় হেয়ারের মতো এমন একজন ব্যক্তিও ছিলে না যিনি তাঁর সমস্ত অর্থসামর্থ্য ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ভারতীয় শিক্ষার জন্য ব্যয় করেছেন। কিন্তু তদানিন্তনকালের সমাজ বাস্তবতা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্বে তাঁকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য করে— প্রত্যক্ষভাবে তিনি এর সাথে যুক্ত থাকতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে হেয়ার ওতপ্রোতভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হন। সব বাধা কাটিয়ে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হল। ভারতীয় ইতিহাসের সেই মহাশুভ লগ্নে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি



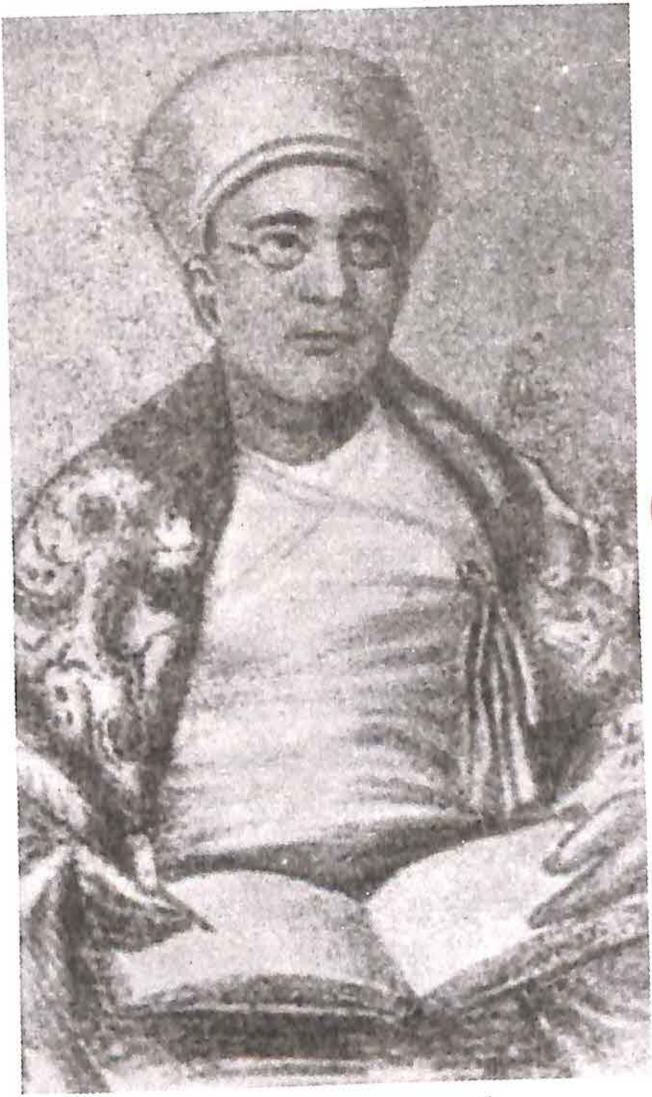
মতিলাল শীল (১৭৯১-১৮৫৪)

হাইড ইস্ট, জে. এইচ হ্যারিংটন, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য যে রামমোহনকে নিয়ে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তা হেয়ারের মধ্যস্থতায় দূর হবার পর বিচারপতি হাইড ইস্টকে সভাপতি এবং জে. এইচ, হ্যারিংটনকে সহ সভাপতি হিসেবে গ্রহণ করে একটি কমিটি গঠিত হয়। কুড়ি জন দেশিয় সদস্য এবং আটজন ইউরোপিয় সদস্য কমিটিতে নেওয়া হল। দেশিয়দের পক্ষ থেকে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইংরেজদের পক্ষ থেকে লেফটেনেন্ট আর্ডিন কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং কলেজের নাম হল 'কলকাতা হিন্দু কলেজ'।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং তাঁকে পরিচলনা করার প্রচেষ্টায় হাইড ইস্ট প্রাথমিক উদ্যোগের পর কোথায় হারিয়ে গেলেন, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও তাই এবং রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারের অন্যান্য কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। কিন্তু ডেভিড হেয়ার মাতৃস্নেহে এবং ঐকান্তিক একাগ্রতায় আমৃত্যু হিন্দু কলেজের সাথে নিজেকে সংযুক্ত রেখেছেন। হিন্দু কলেজ শুধু বঙ্গাদেশের নয়— এটি ভারতের সর্বপ্রথম ইংরেজি শিক্ষার কলেজ।

রাধারমণ মিত্রের মতে, "David Hare was not only the founder but the greatest friend and benefactor of the Hindoo college..... He placed his time, labour and advice and even property ungrudgingly at its service... He was elected a manager of the college



রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪)

in 1825, and he filled that office till his death."

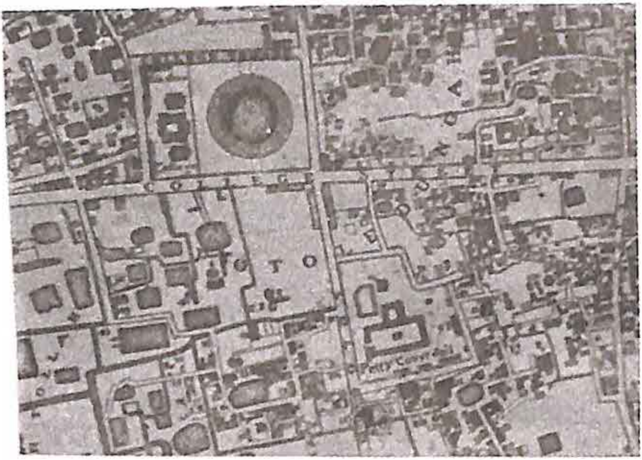
হিন্দু কলেজ বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণের সাধন-পীঠ। হিন্দু কলেজ যাত্রা শুরু করেছিল মাত্র কুড়ি জন ছাত্র নিয়ে। নামে কলেজ হলেও তাতে ছিল দু'টি আলাদা বিভাগ— একাংশ পাঠশালা, অন্য অংশ মহা পাঠশালা। প্রথম বিভাগে যারা পড়ত তাদের বয়স আট থেকে বারোর মধ্যে। বারো বছর বয়স থেকে ছাত্রদের দ্বিতীয় বিভাগে বসার অধিকার জন্মাত।

১৮৩৯ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫৩৯ জন, প্রথম বিভাগে অর্থাৎ পাঠশালা বিভাগে ছাত্র ছিল ৩৭২ জন। ১৮৫৫ সালে হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় বিভাগের নাম 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' এবং প্রথম বিভাগের নাম হয় 'হিন্দু স্কুল'।

ডেভিড হেয়ারের অন্যান্য অবদান

প্রায় ২৫ বৎসর সময়কালের মধ্যে হেয়ার শিক্ষাসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। হেয়ার ছিলেন অকৃত্রিম ভারত-প্রেমী, আধুনিক শিক্ষানীতির প্রবক্তা, সহৃদয় দানব্রতী ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সমর্থক। শিক্ষার ক্ষেত্রে, একদিকে পাশ্চাত্য ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, অন্যদিকে দেশিয় ভাষা ও শিক্ষার উন্নতি— দু'টি বিষয়েই ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। শুধু শিক্ষার ব্যাপারেই তিনি আবদ্ধ ছিলেন না বহু জনহিতকর আন্দোলনেও তিনি সামিল হয়েছিলেন।

রাজনীতি ও সমাজনীতির দিক থেকে হেয়ার ছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সমগোত্রীয়। তাই তিনি দাবি করেন— বিচার ব্যবস্থায় জুরি প্রথা প্রবর্তন, সংবাদপত্রের



গোলদিঘি ও হিন্দুকলেজসহ পটলডাঙ্গা অঞ্চলের সার্ভে প্লানের প্রচ্ছদ ১৮৩৫

স্বাধীনতা, চার্টার আইনের কয়েকটি আপত্তিকর বিষয়ের সংশোধন এবং আদালতে ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন। ইংলন্ডের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্দেশ্যের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য কলকাতায় যে মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রস্তাব হেয়ার সমর্থন করেন। ১৮৩৫ সালে ভারতীয় কুলিদের জোর করে মরিশাস-এ পাঠাবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে হেয়ার 'ইয়ং বেঙ্গাল' দলের সাথে হাত মিলিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন এবং পটলডাঙ্গায় অন্যায়ভাবে আটকে রাখা শতাধিক ধাঙড়ের মুক্তির জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার লিখেছেন, "Hare's contribution to introduction of the system of trial by jury in civil cases in the supreme court as well as extending the JURY System through out the country is well known. He could not tolerate any restriction either on the freedom of the Press or on holding public meetings by the people of India. He took active part in the agitation which ultimately led to the restoration of the freedom of the Press by Act XI of 1835.

ভারতে কৃষি ও উদ্যানসমূহের উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৮২৩ সালে উইলিয়াম কেরির প্রচেষ্টায় 'এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার ১৮২৯ সালে এই সোসাইটির সভ্যপদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৩০ সালে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতিরও সদস্যপদ লাভ করেন। ওই বছর তিনি কফি, চা ও চিনি উপসমিতি এবং চাযের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি উপসমিতিরও সদস্য হয়েছিলেন।

ভারতের শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রথম পথপ্রদর্শক ডেভিড হেয়ার। ধর্মমতে তিনি খ্রিস্টান কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই মিশনারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে তিনি কখনও যুক্ত হন নি। শিক্ষার সাথে কোনো অবস্থাতেই

তিনি ধর্ম বা ধর্মাচারের সংযুক্তি চাননি। সেই সময়ে এক দিকে খ্রিস্টান মিশনারীদের গোঁড়ামি ও ভারতে ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে এদেশিয় ব্যক্তিদের ধর্মীয় মৌলবাদ, এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে তিনি অবিচল লক্ষ্যে ভারতে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সেই যুগে পৃথিবীর খুব কম দেশেই শিক্ষা নায়কেরা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। ডেভিড হেয়ার যে শিক্ষার জন্য সারা জীবন কাজ করেছেন সেটা ধর্মনিরপেক্ষ হলেও নীতি ও আদর্শ বর্জিত শিক্ষা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংস্পর্শে এসে এদেশের সাধারণ মানুষের জীবন আত্মিক ও সামাজিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া এবং আদর্শবিহীন হয়ে পড়েছিল। ডেভিড হেয়ার চেয়েছিলেন যে যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে এদেশের নতুন প্রজন্মের মধ্যে মনুষ্যত্ব-বোধের উন্মেষ ঘটাতে। হেয়ারের ধর্ম ছিল মানব ধর্ম। এই মানবধর্মের স্বার্থেই তিনি অর্থোপার্জনের ইচ্ছা ত্যাগ করেছিলেন এবং অর্জিত ও সঞ্চিত অর্থ জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্যয় করেছেন। সেদিনের ভারতে স্বাধীন মননশক্তি বিকাশের উপযোগী যুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ছিল না বললেই চলে। তাই হেয়ার চেয়েছিলেন যে

এদেশের নতুন প্রজন্ম শেক্‌সপিয়ার, মিল্টন, বেকন, বেন্থাম ও হিউম প্রমুখের সৃষ্টির সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করে তাঁদের বক্তব্য ও আদর্শ হৃদয়ঙ্গাম করুক এবং শিক্ষা লাভ করুক নতুন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতি। আমাদের শাস্ত্র ও সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা এসেছে মূলত ইংরেজি শিক্ষা থেকে। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আজীবন কাজ করে ডেভিড হেয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের সেই সংগ্রামকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন।

ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপের উন্নত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে সংযোগই বাংলা নবজাগরণের প্রধান অনুঘটক হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বাংলা নবজাগরণে ডেভিড হেয়ারের ভূমিকার সঠিক উপলব্ধির জন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। "শিক্ষার মাধ্যম প্রসঙ্গে সেই যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, সেক্ষেত্রে হেয়ারই বলেছিলেন— পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার খুলে দেওয়া হোক্ মাতৃভাষার মাধ্যমে।" এর সাথে ইংরেজি ভাষার সামর্থ্য অর্জনের বিষয়টিকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাঙলার মানুষদের বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতির জন্য হেয়ার ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে সক্রিয় হয়েছেন। কিন্তু ছাত্রদের তিনি নিছক কেরাণী হিসেবে তৈরি করতে চান নি, চেয়েছেন মানুষ

হিসেবে গড়ে তুলতে। শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় অথবা মুখস্থ বিদ্যায় মানুষ হওয়া সম্ভব না। এই কারণে তিনি বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষার বাইরে ছাত্রদের বিবিধ কর্ম প্রচেষ্টার সমর্থক ছিলেন।

হেয়ারের মৃত্যু

১৮৪২ সালের ১ জুন এক দুর্যোগপূর্ণ দিনে হেয়ারের মৃত্যু হয়। শোনা যায় কোনো কলেরা রোগীর সেবা করতে গিয়ে ১৮৪২ সালের ৩১ মে হেয়ার নিজেই ওই রোগে আক্রান্ত হন। এই জনশ্রুতিকে ভিত্তি করেই হয়তো কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন— "কুড়ায়ে পথের রোগী, সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ, তবুও নাস্তিক তুমি। ও অস্থি নেবে না গোরস্থান।"

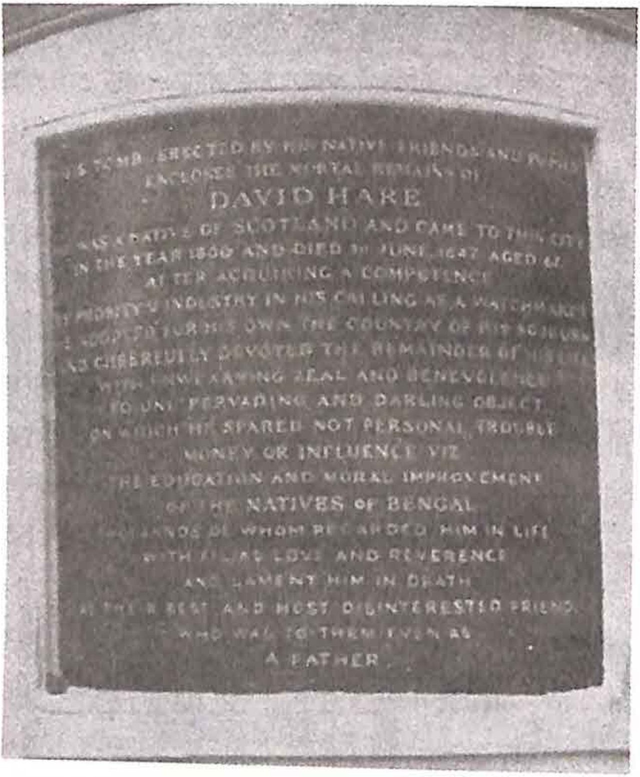
হেয়ার অসুস্থ হবার পর তাঁর চিকিৎসা করেন ডা. প্রসন্নকুমার মিত্র। উনি হেয়ার-পরিচালিত মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে কোনো কাতরোক্তি তিনি করেন নি। তিনি তাঁর ছাত্রকে বলেন— 'পেটে আর সরষের তেলের পুলটিশ দিও না, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।' প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত





'হেয়ার স্কুল'-এ রক্ষিত ডেভিড হেয়ারের প্রস্তর মূর্তি

হেয়ার-জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত প্রভৃতি সহ প্রায় পাঁচ সহস্র ব্যক্তি হেয়ারের শব-শোভাযাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন। মণীষী ভোলানাথ চন্দ্রের মতে, মৃত্যুর পর তাঁকে যেন কোনো খ্রিস্টান সমাধিভূমিতে কবর না দিয়ে নিজস্ব স্কুল ও হিন্দু কলেজের মধ্যবর্তী (বর্তমানে কলেজ স্কোয়ারে) তাঁর নিজস্ব জমিতে কবর দেওয়া হয়— এই ইচ্ছা তিনি তাঁর বন্ধু এবং একই বাড়ির বাসিন্দা গ্রে সাহেবের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এ'সম্পর্কে আরও একটি মত প্রচলিত আছে— রাধারমণ মিত্র লিখেছেন যে, মিশনারীগণ খ্রিস্টান সমাধিভূমিতে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে অস্বীকার করায় কলেজ স্কোয়ারে তাঁকে গোর দেওয়া হয়। কারণ হেয়ার সাহেব না-কি নাস্তিক ছিলেন। হেয়ারের মৃত্যুর দিনটি ছিল দুর্যোগপূর্ণ, কলকাতায় প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও বহু ডিরোজিয়ানসহ হেয়ারের প্রাক্তন ছাত্রেরা তাঁর শব-শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিল। হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় মেডিকেল কলেজের সভাগৃহে ১৮৪২ সালের ১৭ জুন। এই সভায় হেয়ার মেমোরিয়াল কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির উদ্যোগে (২/১টি বছর বাদে) প্রত্যেক বছর ডেভিড হেয়ারের স্মরণে একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক বছর ১ জুন,



কলেজ স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের সমাধি ক্ষেত্রের প্রস্তর ফলক

তাঁর মৃত্যুর দিন, বহু হেয়ার অনুরাগী মানুষ কলেজ স্কোয়ারে হেয়ারের সমাধিক্ষেত্রে মিলিত হন।

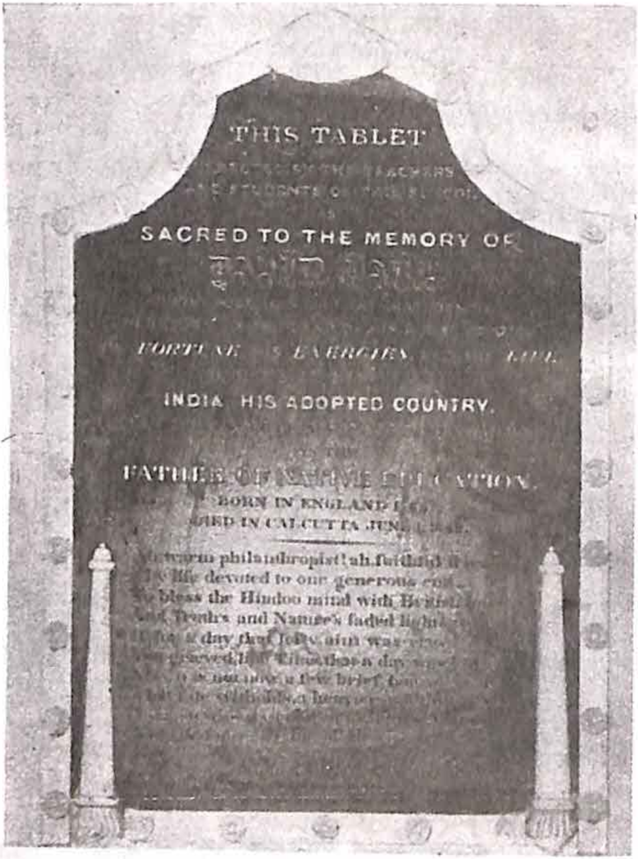
এই প্রসঙ্গে দুঃখের সাথে স্মরণ করতে হয় যে সাধারণভাবে কলকাতার খ্রিস্টান সমাজ হেয়ার-কে পছন্দ করত না— তাঁকে তারা নাস্তিক, ভগবানে অ-বিশ্বাসী বলে গালাগাল দিত। অন্যদিকে হিন্দু সমাজের গোঁড়া কিছু

মানুষ জনের মধ্যেও হেয়ার সম্পর্কে বিরূপতা লক্ষ্য করা যেত। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা, বিশেষত ডিরোজিও শিষ্যেরাই হেয়ার-এর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ডিরোজিও-শিষ্যরাই বিশেষ উদ্যোগী হন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় প্রত্যেক বছর হেয়ার-এর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হত। ডিরোজিও-শিষ্য প্যারিচাঁদ মিত্রই প্রথম ডেভিড হেয়ারের জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন।

ধর্মমতের জন্য যখন এক শ্রেণির পত্র পত্রিকা হেয়ারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে, তখন ডিরোজিও-শিষ্যদের মুখপত্র 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর'-এর পাতায় সম্পাদকের কাছে লেখা একটি পত্রে একজন পাঠক যে মন্তব্য করেছিলেন সেটি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য—

"হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, একথা ঠিক নয়। তবে তিনি শুধু খ্রিস্টান ছিলেন না। তিনি মনে করতেন যে খ্রিস্টধর্মে যে সত্য আছে তা সমভাবেই রয়েছে হিন্দু ধর্মে বা মুসলমান ধর্মেও। এক কথায় হেয়ার ছিলেন সব রকম গোঁড়ামীর উর্ধ্বে।

খ্রিস্টান মিশনারিদের সম্পর্কে ধর্ম সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে তাঁর কোনো বিরূপ মনোভাব ছিল, একথা বলা সঙ্গত না। তিনি জুরি-বিচার প্রবর্তনের দাবিতে শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্‌ট মিশনের সাথে যৌথভাবে আন্দোলন করেছেন এবং কৃষির উন্নতি কল্পে উইলিয়াম কেরি প্রতিষ্ঠিত এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটিতেও যোগদান করেছিলেন।



হেয়ার স্কুলে ডেভিড হেয়ারের মূর্তির দেওয়ালে অঙ্কিত লেখা

হেয়ার-এর বিরোধিতা ছিল রাজশক্তির সুবাদে ভারত-বাসীদের খ্রিস্টান করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে।" খ্রিস্টধর্ম ভারতীয়দের ধর্মের চেয়ে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ, মিশনারিদের এই অপপ্রচারের প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তি ছিল, খ্রিস্টধর্মে

যে সব সদুপদেশ আছে, অনুরূপ সদুপদেশ আছে হিন্দু ও মুসলিম— ভারতের এই দুই প্রধান ধর্মেও; কাজেই খ্রিস্টধর্মের শরণ না নিলে ভারতীয়দের উদ্ধার নেই, এমন মনোভাব তিনি কোনো মতেই স্বীকার করতে পারেন নি। বরং তাঁর শিক্ষাদান-নীতি বিশ্লেষণের ফলে এই সিদ্ধান্তই করা সঙ্গত যে, হিন্দুদের হিন্দু হিসেবে গড়ে ওঠাই পূর্ণতা লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন।”

প্রধান সহায়ক গ্রন্থাদি

১। Peary Chand Mitra – Biographical Sketch of David Hare, 1877 (Basumati Sahitya Mandir Ed. 1949)

২। ডেভিড হেয়ার জন্মদ্বিশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৫-৭৬।

৩। যোগেশচন্দ্র বাগল— উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা।

৪। রাধারমণ মিত্র— 'এখন নৈর্ঋত' (বিশেষ সংখ্যা শতাব্দীর পদাতিক রাধারমণ মিত্র)।

৫। কোরক সাহিত্য পত্রিকা। (স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ের শিক্ষা ও শিক্ষানিকেতন)।

৬। সনৎ মিত্র — 'প্রভাতী তারা' ডেভিড হেয়ার। ১৯৭৬।

৭। রাজনারায়ণ বসু— সে কাল আর এ কাল (বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ)

যদি প্রয়োজনের কথা সরিয়ে রেখে কেবল সাহিত্যপাঠের বিনোদনের কথাও ভাবি তবে দেখব, এমন অনেক জীবনকথা আছে যা কাল্পনিক রহস্য উপন্যাসের থেকেও চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর অথচ একান্ত বাস্তব। পাঠক যতই সে জীবনরহস্যের খনির ভেতরে প্রবেশ করবেন ততই কোন কাল্পনিক রত্নের ঝলক নয়, শুদ্ধ রত্নের দ্যুতির মুখোমুখি হবেন।

আমাদের প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সমাজ, সংস্কৃতি, দেশ ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গবেষকের সততা নিয়ে বরণীয় ও স্মরণীয় জীবনগুলিকে চিত্রভাষের-শৈলীতে পাঠকের কাছে তুলে ধরা। প্রধানত কিশোর-কিশোরীদের কথা ভেবে লেখা হলেও অনুসন্ধিৎসু পাঠকও গ্রন্থগুলি থেকে নতুন তথ্য পাবেন। অতীতকে সমকাল ও উত্তরকালের কাছে অমলিন রাখাই আমাদের লক্ষ্য।

9788175722996